গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক

আলকাউসার

www.alkawsar.com

রবিউস সানি ১৪৩৯

জানুয়ারি ২০১৮

ینایر

مجلة الكوثر الشهرية تصدر عن مركز الدعوة الإسلامية داكا [للبحوث والدراسات العليا وشؤون الدعوة]

banglabookcenter.blogspot.com

Scanned by CamScanner

www. alkawsar.com

প্রতিষ্ঠা

মুহাররম ১৪২৬ হি., ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ঈ.

প্রতিষ্ঠাকালীন উপদেষ্টা

হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী রাহ.

তত্ত্বাবধায়ক

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

সম্পাদক

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

সহ-সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

বিনিময় : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সর্বপ্রকার যোগাযোগ

মাসিক আলকাউসার
৩০/১২, পল্লবী
(মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬

E-mail : info@alkawsar.com

ফ্যাক্স : ৮০৩৪৫০৮

মোবাইল : ০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ২২

সার্কুলেশন :

০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৩৩ (এজেন্ট)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৪৪ (গ্রাহক)
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৫৫ (হাতে হাতে)

ব্যাংক একাউন্ট নম্বর

মাসিক আলকাউসার
১. চলতি হিসাব নং ১৬৪.১১০.১৭৯৩
ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড
মিরপুর-১০ শাখা, ঢাকা
২. চলতি হিসাব নং ১৩৫১২২০০০০১৭৩
আলআরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
পল্লবী শাখা, ঢাকা

www.banglabookcenter.blogspot.com

مجلة الكوثر الشهرية

تصدر عن مركز الدعوة الإسلامية داكا (للبحوث والدراسات العليا وشؤون الدعوة)

গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর মুখপত্র

মাসিক আলকাউসার

বর্ষ : ১৪, সংখ্যা : ০১
রবিউস সানি ১৪৩৯ ॥ জানুয়ারি ২০১৮ ॥ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৪

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়..০২

মুমিন প্রতারণা করে না প্রতারিতও হয় না........................০৪
মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

আসুন ঈমান তাজা করি, ইসলামের ভাষায় কথা বলি ০৬
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রেক্ষাপট : মধ্যপ্রাচ্য ও আরবজাহান
জাগুক মুহাম্মাদ নামের দায়িত্ববোধ........................০৯
মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

দুআয়ে মাগফিরাতের আবেদন ১২

স্মরণ রাখুন কর্মের লক্ষ্য, জীবনের উদ্দেশ্য........................১৩
মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

জ্যোতির্বিজ্ঞানে মধ্যযুগের মুসলমানদের অবদান........................১৬
ড. গোলাম কাদির লূন

হযরতজীগণের হেদায়েতের আলোকে
দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে ব্যক্তি নয় কাজই মুখ্য........................২১
রাইয়ান বিন লুৎফুর রহমান

'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'........................২৩
শিব্বীর আহমদ

প্রচলিত 'ইঞ্জিল শরীফ' কুরআনে বর্ণিত ইঞ্জিল নয়........................২৬
আবু মাইসারা মুনশী মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন

পরিবারের সবার জন্য দ্বীনশিক্ষা
আসুন! দ্বীন শিখি দ্বীন শেখাই........................২৮
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

প্রচলিত ভুল ৩১

আপনি যা জানতে চেয়েছেন ৩২

শিক্ষার্থীদের পাতা ৪০

শিশু-কিশোর........................৪৪

ফিলহাল ৪৬

Scanned by CamScanner

দু'জন মেয়রের পরলোকগমন

চাই ঈমানী দৃষ্টি, ঈমানী মূল্যায়ন

সম্প্রতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'জন মেয়রের ইন্তিকাল হয়েছে। চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক। দুই মেয়রের মৃত্যুই জনমনে বেশ নাড়া দিয়ে গেছে। দু'জনই ছিলেন দুনিয়ার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। অর্থ-বিত্ত, নাম-যশ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, যা কিছু আজকালের মানুষের আরাধ্য তার অনেক কিছুই তাদের ছিল। এবিএম মহিউদ্দিন প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করলেও আনিসুল হক অভিহিত হতেন তরুণ ও স্মার্ট মেয়র হিসেবে। সম্ভবত একারণে তার মৃত্যু আরেকটু বেশি নাড়া দিয়েছে।

তাদের মৃত্যুর পর যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। মিডিয়ায় এসেছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-স্মৃতিচারণ। এসব আয়োজনে বিষাদ আছে, স্মৃতিকাতরতা আছে এবং সর্বোপরি আনুষ্ঠানিকতা আছে। কিন্তু একজন ঈমানদারের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে জিনিসটির তা নেই।

মেয়র মহিউদ্দিন কিংবা মেয়র আনিসুল হক তাদের মৃত্যু এক অমোঘ বাস্তবতারই দৃষ্টান্ত। দু'জনই ছিলেন পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সময় যখন ফুরিয়েছে কিংবা বলুন সময় যখন এসেছে দু'জনকেই চলে যেতে হয়েছে। তাদের পদ-পদবী, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত-অনুরক্ত, সেবক-সমর্থক সব রয়েছে আপন জায়গায়, কিন্তু তাদেরকে চলে যেতে হয়েছে মাটির নীচে। এটিই এই পৃথিবীর অনিবার্য সত্য, যা বিস্মৃত হওয়া যায়, কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যায় না। প্রয়াত দুই মেয়র এই সত্যেরই নাড়া দিয়ে যাওয়া দুই দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত থেকে নিজের জন্য কিছু শিক্ষা ও সচেতনতা অর্জন করা কাম্য এবং এটিই বুদ্ধিমানের পরিচয়।

মেয়র মহিউদ্দিন কিংবা মেয়র আনিসুল হক তাদের মৃত্যু এক অমোঘ বাস্তবতারই দৃষ্টান্ত। দু'জনই ছিলেন পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সময় যখন ফুরিয়েছে কিংবা বলুন সময় যখন এসেছে দু'জনকেই চলে যেতে হয়েছে। তাদের পদ-পদবী, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত-অনুরক্ত, সেবক-সমর্থক সব রয়েছে আপন জায়গায়, কিন্তু তাদেরকে চলে যেতে হয়েছে মাটির নীচে। এটিই এই পৃথিবীর অনিবার্য সত্য, যা বিস্মৃত হওয়া যায়, কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

ঈমানী দৃষ্টি

কুরআন মাজীদের এক শিক্ষা হচ্ছে, اعتبار। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেওয়া। কুরআন মানুষকে যে চিন্তা-নৈতিক উচ্চতায় উন্নীত করতে এসেছে তার এক স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'ই'তিবার'। এটি সৌভাগ্যের সোপান এবং সৌভাগ্যবানের আলামত।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন–

الشَّقِيّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ.

অর্থাৎ মন্দভাগ্য সে, যে মাতৃগর্ভেই মন্দভাগ্য (ফলে সে অন্যের অবস্থা থেকে শিক্ষা নেয় না) আর সৌভাগ্যবান সে (যে মাতৃগর্ভেই সৌভাগ্যবান এবং) যে অন্যের দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৪৫

তাহলে অন্যের অবস্থা ও পরিণাম থেকে নিজের জন্য শিক্ষা নেওয়া বা না নেওয়া হচ্ছে সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এর দ্বারা প্রত্যেকে নিজের অবস্থা বিচার করতে পারে।

অন্যের অবস্থা লক্ষ্য করে নিজের দিকে তাকাবার প্রেরণা যদি জাগে তাহলে তা সৌভাগ্যের লক্ষণ। এই প্রেরণা ও উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ এগিয়ে যেতে পারে উন্নতি ও আত্মোৎকর্ষের পথে। কাজেই সৌভাগ্যের উপায় মনে করে এর সঠিক ব্যবহার কাম্য। পক্ষান্তরে অন্যের অবস্থা দেখেও যদি নিজের দিকে তাকাবার ফুরসত না ঘটে তাহলে এটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এই বিস্মৃতি ও অবহেলা পরিণামে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত করতে পারে। কাজেই সাবধান হওয়া উচিত এবং দুর্ভাগ্যের পথ ছেড়ে সৌভাগ্যের পথে আসা উচিত।

এই যে চেতনা, নিজেকে ও নিজের জীবনকে উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা; এটাই তো সত্যিকারের জ্ঞান। নিজেকে জানার চেয়ে এবং আপন কর্মের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেয়ে বড় উপকারী জ্ঞান আর কী হতে পারে? এই বাস্তব জ্ঞানেরই এক উপায় হচ্ছে 'ই'তিবার'– শিক্ষণীয় বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। বিখ্যাত মনীষী হাতিমে আসাম রাহ. বলেছেন–

من العبرة يزيد العلم ومن الذكر يزيد الحب ومن التفكر يزيد الخوف

শিক্ষাগ্রহণ জ্ঞান বৃদ্ধি করে, স্মরণ বৃদ্ধি করে ভালবাসা আর চিন্তা-ভাবনা বৃদ্ধি করে ভয়।

জীবনকে সঠিক গন্তব্যের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যেমন প্রয়োজন সঠিক জ্ঞানের তেমনি প্রয়োজন ভয় ও ভালবাসার। 'ইলম' যেমন ঈমানের এক শাখা তেমনি আল্লাহ ভয় ও ভালবাসাও ঈমানের শাখা।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর প্রতি ভালবাসাই তাঁর আনুগত্যকে সহজ করে দেয় আর আল্লাহর ভয় সহায়তা করে তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে। আর সঠিক জ্ঞান নির্দেশ করে সত্য-ন্যায়ের পথ। এই জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং এই ভয় ও ভালবাসা, এককথায় মানুষের অভ্যন্তরীণ এই প্রেরণাসমূহ কীভাবে জাগ্রত হয়? এই প্রেরণাসমূহ জাগ্রত হয় চিন্তা-ভাবনা, স্মরণ ও শিক্ষাগ্রহণ দ্বারা। নিজের সম্পর্কে ভাবুন, আল্লাহর নিআমতসমূহ স্মরণ করুন আর চারপাশের সব কিছু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, আপনার ভেতরের ঐ সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হবে, যা আল্লাহর হুকুমে আপনাকে পরিচালিত করবে সঠিক পথে।

কিন্তু আমাদের চারপাশে আলোচনার যে ধারা, জীবন ও জগতের ঘটনারাজিকে মূল্যায়নের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা কি আমাদেরকে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক-সচেতন করছে, না আরো বেশি করে বিস্মৃতি ও উদাসীনতার দিলে ঠেলে দিচ্ছে?

মৃত্যুর মতো একটি ব্যাপার, যা মানব-মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেওয়ার কথা এবং মানবের মনে আখিরাতের ফিকির জাগ্রত করার কথা তা-ই কি আমাদেরকে আরো বেশি আয়োজন ও অনুষ্ঠানমুখী করছে না? করে তুলছে না স্মরণ ও স্মৃতিচারণের শিরোনামে আরো বেশি আলাপচারিতামুখী? যা নিঃশেষ করে দিচ্ছে নিজের দিকে তাকাবার এবং একান্তে নিজের পরিণাম নিয়ে ভাববার

আমাদের পূর্বসূরি সাহাবা-তাবেয়ীন, যাঁরা ছিলেন উন্নত কর্ম ও নির্মল জীবনের আদর্শ নমুনা তাঁদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

তাঁদের চোখ ও হৃদয় দুই-ই ছিল সজাগ, তাই যা তাঁরা দেখতেন তা হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতেন। তাঁরা শুধু বাইরের পরিপাটিতায় ব্যস্ত থাকতেন না, কলব ও হৃদয়েরও যত্ন নিতেন।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর অন্তরের পরিচর্যার জন্য কোনো বিরাণ ঘরের সম্মুখে চলে যেতেন এবং বেদনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলতেন–

أين اهلك

কোথায় তোমার অধিবাসী?

এরপর নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন–

كل نفس هالك إلا وجهه

অর্থাৎ এক আল্লাহ ছাড়া আর সবাই মরণশীল।

–তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৪৩৯

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর এই বাণী তো সুপ্রসিদ্ধ–

كل يوم يقال : مات فلان وفلان ولا بد من يوم يقال : مات عمر

প্রতিদিন ঘোষণা হয়, অমুকের মৃত্যু হয়েছে, অমুকের মৃত্যু

কিন্তু আমাদের চারপাশে আলোচনার যে ধারা, জীবন ও জগতের ঘটনারাজিকে মূল্যায়নের যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা কি আমাদেরকে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক-সচেতন করছে, না আরো বেশি করে বিস্মৃতি ও উদাসীনতার শিকার করে দিচ্ছে? মৃত্যুর মতো একটি ব্যাপার, যা মানব-মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেওয়ার কথা এবং মানবের মনে আখিরাতের ফিকির জাগ্রত করার কথা তা-ই কি আমাদের আরো বেশি আয়োজন ও অনুষ্ঠানমুখী করছে না? করে তুলছে না স্মরণ ও স্মৃতিচারণের শিরোনামে আরো বেশি আলাপচারিতামুখী?

প্রেরণাকে? যিনি বলেছেন সত্য বলেছেন–

من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة .

যে দুনিয়াকে দেখে শিক্ষাগ্রহণের আলোহীন চোখে সে পৃথিবীকে (যতটুকু) দেখে তার অন্তর্দৃষ্টি ততটুকু নিষ্প্রভ হয়ে যায়।'

তখন অবস্থা এই হয় যে, মানুষ দেখে, কিন্তু এই দেখা তার কর্ম ও বিশ্বাসকে সংশোধন করে না; মানুষ শোনে, কিন্তু সেটা তার জীবন ও কর্ম গঠনে কোনো প্রভাব ফেলে না। এ যেন তাদের অবস্থা, যাদের সম্পর্কে কুরআন বলছে–

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰٓىِٕكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ.

তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দ্বারা শোনে না। এরা পশুর ন্যায়; বরং আরো বিভ্রান্ত। এরাই গাফেল। –সূরা আ'রাফ (৭) : ১৭৯

অন্য আয়াতে–

فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ.

বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। –সূরা হজ্ব (২২) : ৪৬

হয়েছে। একটি দিন তো অবশ্যই এমন আসবে যেদিন বলা হবে, ওমরের মৃত্যু হয়েছে।

এ হচ্ছে অন্যের অবস্থা থেকে নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দৃষ্টান্ত।

কাজেই যে চলে গেল শুধু তার স্মৃতিচারণেই বাধা পড়ে থাকা নয়, নিজের কথাও একটু ভাবুন, আপন বিশ্বাস ও কর্মের হিসাবও একটু মিলিয়ে দেখুন। যে গেছে সে তো চলেই গেছে, আপনার হাতে যে ক'টি মুহূর্ত এখনো অবশিষ্ট আছে সেগুলোর প্রতি একটু সদয় হোন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে কবর যিয়ারতের যে তারগীব, তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই তো নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া–

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

আমি তোমাদের কবর-যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। তো এখন যিয়ারত কর। কারণ তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩০০৫

গোরস্তানে মাটির ঢিবিগুলোর নীচে যারা শায়িত, এ কি শুধু তাদেরই নিয়তি, না এ আমাদেরও ললাট-লিখন? কেউ কি পারবে নিয়তির এই লিখন খণ্ডাতে?

অবশ্যই সকল প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, একমাত্র তিনিই চিরজীবী। •

Scanned by CamScanner

মুমিন প্রতারণা করে না প্রতারিতও হয় না

মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

ঈমানদার অন্যের সাথেও প্রতারণা করে না, নিজেও প্রতারিত হয় না। অন্যের সাথে প্রতারণা না করা সাধুতা ও দিয়ানতদারির পরিচয় আর প্রতারিত না হওয়া সচেতনতা ও দূরদর্শিতার পরিচয়। মুমিনকে যেমন দিয়ানতদার হতে হয় তেমনি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শীও হতে হয়। চারপাশের ঘটনাবলীর যথার্থ বিশ্লেষণে ও সঠিক করণীয় নির্ধারণে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার বিকল্প নেই।

শিরোনাম থেকেই আজকের আলোচনা শুরু করছি। সাম্প্রতিক কয়েকটি বিষয় নিয়ে পাঠকের সাথে একটু আলোচনা করতে চাই। মনে হচ্ছে সবগুলো বিষয়েই কথাটি প্রযোজ্য।

প্রথমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বায়তুল মুকাদ্দাস (জেরুজালেম)-কে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করা নিয়েই একটু বলি। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রটি যে একটি অবৈধ ও চাপিয়ে দেয়া রাষ্ট্র এটা একটা স্বীকৃত বিষয়। যুগযুগ ধরে যারা এই ভূখণ্ডের অধিবাসী তাদেরকে চরম জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত করে সেই জায়গায় ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আমাদের অনেকেরই জানা আছে। সেই দিকে যাব না। শুধু এইটুকু বলি, ১০৯৯ সালে ক্রুসেডারদের ফিলিস্তীন অঞ্চল জবরদখল করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমানকে কতল করার পর মাত্র ৮৮ বছরের মাথায় ১১৮৭ সালে হিত্তীন যুদ্ধের পরপরই সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী এই ভূখণ্ডকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এরপর ১৯১৭ সালের ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ছত্রছায়ায় পুনরায় এই অঞ্চল অধিকৃত হওয়ার পর ১০০ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে মুসলিমবিশ্বে আরেকজন সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর আবির্ভাব এখনো ঘটেনি। আর একারণেই ট্রাম্পের মত লোকেরা তাদের কাজগুলো নির্বিঘ্নে করে যেতে সক্ষম হচ্ছেন। খোলা চোখে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্প এই কাজটি সম্পন্ন করেছে; কিন্তু সচেতন লোকেরা জানেন যে, এটা ১৯৯৬ সালেই পাশ হওয়া বিল। তবে এইটুকু কথা ঐ বিলে ছিল যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট চাইলে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি রাখতে পারবেন। এই বিল পাশ হওয়ার পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা তা ছ'মাস ছ'মাস করে মুলতবি করে আসছিলেন আর নির্বাচনের সময় ঘোষিত কথা অনুযায়ী ট্রাম্প তা কার্যকর করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ট্রাম্প তা কার্যকর করার জন্য বর্তমান সময়টিকে উপযুক্ত সময় কেন মনে করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের অবস্থা একটু দেখতে হবে। সৌদি আরব, আমিরাত, মিসর প্রভৃতি আরব দেশগুলোর অবস্থা লক্ষ্য করলেই উত্তর বের হয়ে আসবে। বিশেষত সৌদি আরবের অবস্থা থেকে স্পষ্ট যে, সৌদি এখন আঞ্চলিক পরাশক্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এতে দোষের কিছু ছিল না, যদি আমেরিকার হাতিয়ার হিসেবে না হয়ে স্বতন্ত্র পরাশক্তি হিসেবে গড়ে উঠত। বিশ্ব শান্তির নামে আমেরিকার সাথে সখ্য, প্রথম দিন থেকেই প্রকাশ্যে মুসলিম-বিদ্বেষী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সবার আগে সংবর্ধনা প্রদান এবং তাকে পাশে নিয়ে সৌদি বাদশাহর তলোয়ার হাতে নাচগান– সবই গোটা মুসলিম বিশ্বকে লজ্জায় ফেলেছে। এরই সাথে বাতাসে ভাসছে ট্রাম্পের জামাতা কুশনারের সাথে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স বিন সালমানের সখ্যের সংবাদও। মূলত এই সব বিষয়ই ট্রাম্পকে সুযোগ করে দিয়েছে– আলকুদসকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা দেওয়ার। শাহ ফয়সাল থাকলে কি এমনটা সম্ভব হত!

আরো লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, এ সম্পর্কে ওআইসির বৈঠক হয়েছে ইস্তাম্বুলে। বৈঠকটি জেদ্দায় হতে পারল না কেন? খাদিমে হারামাইন কি তৃতীয় হারামের খাদিম ও মুহাফিয নন? ওআইসির ঐ বৈঠকে দূরের দেশের রাষ্ট্রপতি- প্রধানমন্ত্রীরা যেতে পারলেন, কিন্তু সৌদি, আরব আমিরাত ও মিসর থেকে গেলেন সাধারণ মন্ত্রীগণ।

কাজেই আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে; অন্যদের আগ্রাসনের সাথে খবরদার হতে হবে মুসলমানদের বর্তমান নেতৃত্বের ব্যাপারেও। কারণ মুমিন যেমন অন্যের সাথে প্রতারণা করে না, তেমনি প্রতারিতও হয় না।

। দুই ।

সম্প্রতি ৬ ডিসেম্বর আইসিটি বিষয়ক মেলা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭-এর উদ্বোধন হয়। এতে অন্যতম 'প্রধান আকর্ষণ' বানানো হয়েছিল সোফিয়া নামক একটি রোবটকে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমে 'টেক টক উইথ সোফিয়া' নামে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে তাকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। সাংবাদিকদের তথ্য অনুযায়ী এর জন্য রাষ্ট্রকে ব্যয় করতে হয়েছে ১২ কোটি টাকা। এই রোবটের তথ্য অনলাইনে দেখার পর যে অনুভূতি জেগেছে, দরসে ছেলেদের সাথে সেগুলো আলোচনা করেছি। সে কথাগুলোই পাঠকের সাথেও ভাগাভাগি করছি।

সংবাদে দেখা যাচ্ছে, হল ভর্তি অতিথি-দর্শক একটি রোবটের কিছু যান্ত্রিক কথাবার্তা নিয়ে ব্যাপক মাতামাতি করেছেন। মিডিয়াতেও দেখা গেছে, ব্যাপারটিকে ব্যাপকভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রচেষ্টা। ফলে মানুষকেও উল্লসিত দেখা গেল। একটি রোবট নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলছে, প্রধানমন্ত্রীর নাতনীর নামে তার নাম– সে কথাও বলেছে। সবাই খুব উল্লসিত। একই রোবট সৌদি আরবও ঘুরে এসেছে। পাঠক জেনেছেন, সৌদি আরব প্রথমবারের মতো এই রোবটকে নাগরিকত্বও দিয়েছে। তা নিয়ে অনেকে হাসাহাসিও করেছেন। এদিকে যুবরাজ বিন সালমানের ঘোষিত ভিশন ২০৩০-এ যে সিটির কথা বলা হয়েছে তাতেও নাকি থাকবে হাজার হাজার রোবট। সেটি হবে একটি রোবট-সিটি! এই যে রোবট নিয়ে মাতামাতি, এ নিয়ে যে কথাগুলো বলতে চাই তার আগে বলে নিচ্ছি, মানব-উন্নয়ন ও মানুষের সেবায় প্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহারের আমরা বিরোধী নই। প্রযুক্তি আল্লাহ তাআলার নিআমত। মানুষ আল্লাহ-প্রদত্ত বিদ্যা-বুদ্ধি ব্যবহার করে কিছু নতুন উপায় উদ্ভাবন করবে- এ তো আল্লাহর অসংখ্য দানেরই এক ক্ষুদ্র অংশ। আল্লাহ তাআলা তো এই গোটা বিশ্ব জগৎকে মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন–

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ যদি নিজের দিকে তাকায় এবং তার চারপাশের প্রকৃতি, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ ও আল্লাহর বিচিত্র সৃষ্টির দিকে তাকায় তাহলে যেমন নিজের ক্ষুদ্রতা বুঝতে পারবে তেমনি বুঝতে পারবে যাকে সে নিজের কর্ম মনে করছে তারও ক্ষুদ্রতা।

অন্যদিকে মুসলমান যদি নিজের সমৃদ্ধ অতীতের দিকে তাকায় তাহলেও দেখতে

Scanned by CamScanner

পাবে আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে তারাই ছিল বিশ্বের পথিকৃত। কাজেই নিত্য-নতুন আবিষ্কার এবং এর যথার্থ ব্যবহার কখনোই মুসলমানের কাছে অনভিপ্রেত নয়। এই ভূমিকাটুকুর পর আলোচ্য বিষয়ে যে কথা বলতে চাই তা হচ্ছে :

এক. এটি কি এত মাতামাতির মতো ব্যাপার? রোবট তো অনেক আগে থেকেই আছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রোবট অনেক কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। কে না জানে এখনকার পুঁজিবাদী বিশ্বে প্রত্যেক পণ্য-নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে তার পণ্যের প্রচার করে থাকে। পুঁজিবাদী স্বার্থেই তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা মাতামাতির পরিবেশ তৈরি করে। হংকংয়ের যে কোম্পানিটি এই রোবট উৎপাদন করছে তারা আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য এর নাম দিচ্ছে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'। এটাও তো নতুন কিছু নয়। প্রশ্ন হচ্ছে সফটওয়্যারগুলো আসলে কী? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই তো। তো বিশেষভাবে এটাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলে প্রচার-প্রচারণার উদ্দেশ্য যে কী তা বোধ হয় এতক্ষণে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

দুই. দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, রোবটটি মেয়ের সাজে কেন? তাহলে এখানে উদ্দেশ্য কি প্রযুক্তি, না মানুষকে আকর্ষণ করা। শুধু প্রযুক্তির দিক থেকে দেখলে এটি কি খুব আকর্ষণীয়? নেতা, সাংবাদিকদের সাথে মাপা মাপা কথা- এতে আশ্চর্যের কী আছে? সম্ভবত ৭১ টেলিভিশনের এক সাংবাদিক বেখেয়ালে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নের বাইরে কিছু প্রশ্ন করতেই রোবটের 'বুদ্ধিমত্তা'র পরিচয় প্রকাশিত হয়ে গেল। দেখা গেল সে আর উত্তর দিতে পারছে না। কাজেই হুজুগে না মেতে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত। মানুষ তো প্রাচীন কাল থেকেই মূর্তি বানিয়ে আসছে। আর এখন ইমেজ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে যে কোনো নেতা-নেত্রীরও অবয়ব তৈরি করা সম্ভব। আর রোবটের কথা বলা, তো কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে, যখন ... প্রযুক্তির এইসব আয়োজন-অনুষ্ঠান চলছে তখন রাজধানীতে আরেকটি মেলা চলছিল, পাখি মেলা। একেক পাখির একেক বুলি- 'অতিথি এসেছে, পিড়ি দাও' এমন কত বুলি! পয়সাওয়ালারা অনেক দাম দিয়ে কথা বলা পাখি কিনে বাড়ি ফিরেছে। যাইহোক, রেডিও, টেপরেকর্ডারের পর সিডি, ভিসিডি, অডিও, ভিডিওর এত সহজলভ্য প্রযুক্তি-উপকরণের যুগে এই রোবট নিয়ে এত মাতামাতি, রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা খরচের কী অর্থ থাকতে পারে? ওই যে বহু বছর আগে থেকে কল সেন্টারের যন্ত্রগুলো শুধু একটি নম্বর পেয়েই গ্রাহকের একাউন্টের হরেকরকম তথ্য শুনিয়ে আসছে- তা কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নয়?

মুসলিম দেশগুলোর বাস্তব সমস্যা ও প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে দেশে দেশে বিন সালমানেরা হুজুগ সৃষ্টির জন্য এবং ক্ষমতার মসনদকে নির্বিঘ্ন রাখতে যা কিছুই করুক এতে প্রতারিত হওয়া মোটেই উচিত নয়। উম্মাহর যুবসমাজের কর্তব্য নিজেদের পরিচয় ও উম্মাহর বাস্তব সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা।

তিন. তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশটি একটি শ্রমঘন দেশ। এদেশে শ্রমিক সহজলভ্য বলেই শিল্পপতিরা সাশ্রয়ী মূল্যে শ্রম কিনতে পারছেন। ভবিষ্যতে যদি শ্রমের বাজার রোবট দখল করে তাহলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবন-জীবিকার কী উপায় হবে? আর যদি বলেন, শিক্ষিত লোকদের কাজগুলোও রোবট করবে তবে ভবিষ্যত-শিক্ষিত সমাজ এবং বর্তমানে লক্ষ শিক্ষিত বেকারদের কী হবে? একশ্রেণির প্রযুক্তি ব্যবসায়ী মানব জাতিকে কোন্ পথে নিয়ে চলছে?

আরেকটি আশঙ্কাও কেউ কেউ ব্যক্ত করেছেন। আর তা হচ্ছে মানবহত্যাকারী রোবট! আমরা এ নিয়ে বিশদে যেতে চাই না। প্রযুক্তিবিদেরাই বিষয়টি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারবেন। ক্ষমতাবানেরা নিজেদের স্বার্থ-হাসিলের জন্য প্রযুক্তির এই অপব্যবহারের পথে অগ্রসর হলে মানবজীবনের শান্তি-স্বস্তি-নিরাপত্তার কী হাশর হবে তা কি কেউ বলতে পারে? আর প্রযুক্তি কি সবসময় নিয়ন্ত্রণে থাকে? ব্যাপকভাবে বিশ্বজুড়ে হ্যাকিংয়ের ব্যাপারটি শোনা যায়। কাজেই আমাদের কর্তব্য, প্রতারিত না হওয়া।

। তিন।

ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এদেশে আসার আগে থেকেই মিডিয়া ও পত্রপত্রিকায় প্রচার-প্রচারণা আরম্ভ হয়েছিল। প্রথমে আবহটা ছিল, রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে পোপ ফ্রান্সিসের আগমন; কিন্তু পরে বাস্তবে যা দেখা গেল তা হচ্ছে, তিনি টেকনাফের রোহিঙ্গা শিবিরে গেলেনই না; ঢাকায় কিছু রোহিঙ্গাকে নিয়ে আসা হল 'সমবেদনা গ্রহণ'-এর জন্য। বাংলাদেশে এসে তাকে দেখা গেল প্রধানত খ্রিস্টধর্মীয় যাজকের অভিষেক-অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বাংলাদেশে যেহেতু আইনগতভাবে যে কোনো ধর্মের লোকেরাই বসবাস করতে পারেন তাই কোনো ধর্মের প্রধান ব্যক্তি অতিথি হয়ে আসতেই পারেন, কিন্তু বিষয়টি গণমাধ্যমে যেভাবে প্রচারিত ও উপস্থাপিত হয়েছে, বিশেষত সরকারি টেলিভিশন যেভাবে লাইভ প্রচার করেছে তাকে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কী বলা যায়? নিজস্ব ধর্মীয় কাজে যিনি এসেছেন তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে 'মানবদরদী' হিসেবে! এইসব প্রচার-প্রচারণায় মেতে ব্যাপকভাবে মুসলিমেরাও খ্রিস্টধর্মের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এটা যে ধর্মীয় ও সাধারণ বোধ-বুদ্ধি- কোনো বিচারেই বৈধ ও সমীচীন হয়নি তা কি দলীল-প্রমাণ দিয়ে বলার প্রয়োজন আছে?

যারা অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে অতি উৎসাহের সাথে সব ধর্মের লোকদের অংশগ্রহণের কথা বলেন তারা কি মসজিদে হারামের ইমামদের আগমনে, মুসলমানদের ঈদ, কুরবানী ও অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ থাকেন না? আচ্ছা, ওইসব অনুষ্ঠানে কি কোনো ভিনধর্মীকে মুসলমানদের ইবাদতে যোগ দিতে দেখা যায়?

আমরা অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিরোধী নই, তবে একেতো সেটাও হতে হবে ইসলামের বিধি বিধান অনুসারে, দ্বিতীয়ত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নামে অন্য ধর্মের ধর্মীয় পর্ব-উৎসবে অংশগ্রহণের সুযোগ মুসলমানের নেই। একজন ঈমানদার মুসলমান কীভাবে কুফর ও শিরক সম্পর্কে উদাসীন হতে পারে? কুফর-শিরক এবং এর সকল লক্ষণ ও নিদর্শনের প্রতি অবশ্যই ঈমানদারের অন্তরে ঘৃণা থাকতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নামে কুফর-শিরক সম্পর্কেও উদাসীনতা ও নিজ আদর্শ বিসর্জনের কোনো সুযোগ নেই।

হযরত ওমর রা.-এর ঐ হাদীস তো আমাদের অনেকেরই জানা আছে। তিনি তাওরাতের একটি কপি পেয়ে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে চরম অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। হঠাৎ তা লক্ষ করে ওমর রা. সঙ্গে সঙ্গে তা পড়া বন্ধ করে দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-

أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي.

(বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়)

পথের সন্ধানে

আসুন ঈমান তাজা করি ইসলামের ভাষায় কথা বলি

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

رَضِيتُ بِاللهِ رَبا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيا.

আমি খুশি, আল্লাহ আমার রব। আমি আমার রবকে চিনতে পেরেছি। তিনি আমাকে তাঁর পরিচয় দান করেছেন। তাঁর রুবুবিয়্যাতের উপর ঈমান আনার তাওফীক দান করেছেন। রুবুবিয়্যাতের হক শিক্ষা দিয়েছেন। এর শোকর আদায়ের পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

আমি খুশি, ইসলাম আমার দ্বীন। ইসলাম আমার আকীদা ও ঈমান, ইসলাম আমার জীবনব্যবস্থা ও শরীয়ত।

আমার রব আমাকে ইসলামের হেদায়েত দিয়েছেন। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন এবং কামিল তাহযীব তা বোঝার তাওফীক দান করেছেন। আমি এর উপর অটল অবিচল থাকতে চাই। এর উপর বেঁচে থাকতে চাই। এর উপরই মরতে চাই।

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনও শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আনুগত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে আমি একজন।

আমি সন্তুষ্ট, আমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর উপর নাযিলকৃত শরীয়তের শিক্ষা দান করেছেন। তাঁর সুন্নাত ও উসওয়ায়ে হাসানা–উত্তম আদর্শের পথনির্দেশ করেছেন। ঈমান, আকীদা, শরীয়ত ও উসওয়ায়ে হাসানার সকল উৎস আমাদের জন্য আজও সংরক্ষণ করে রেখেছেন। স্থায়ীভাবে তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

رَضِيتُ بِاللهِ رَبا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيا.

আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

শোকর আদায়ের এই কালেমা, ঈমান তাজা করার এই আযীফা সকাল সন্ধ্যা অর্থ বুঝে, খুব মন দিয়ে তিনবার পাঠ করা উচিত।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার এই কালেমা পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করে দেবেন। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৮৬৭১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৯৭৪৭

আজ যে বিষয়টি সবচে বেশি প্রয়োজন তা হল, নিজেদের ঈমান তাজা করা। ইসলামী আকীদার বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা। আমাদের জানা উচিত, কোন্ আকীদার দাবি কী এবং কোন্ কথা, কাজ বা দৃষ্টিভঙ্গি ঐ আকীদার খেলাফ। আমাদের পর্যবেক্ষণ করা উচিত, কর্মে ও জীবনে ঐ আকীদার কী প্রভাব থাকা উচিত, কিন্তু তা থাকছে না। আমাদের জানা উচিত, কোন্ আমলের দ্বারা ঈমান মজবুত ও সজীব হয়, যাতে সে আমলগুলো পালন করা যায়। আর কোন্ আমলের দ্বারা ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, যার কারণে আমলে দুর্বলতা আসে, চরিত্রের অধঃপতন হয়, যাতে এ জাতীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

আকাইদের (আকীদা-বিশ্বাস) সহীহ ও বিস্তারিত জ্ঞান না থাকার সবচে বড় কুফল এই হয় যে, মানুষ অবচেতন মনে ঈমান-পরিপন্থী কথা ও কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি ঈমান বিধ্বংসী চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ধারক হয়ে যায়। আর ঈমানের দুর্বলতা তো এর ন্যূনতম ফলাফল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, মানুষ ঈমানের হাকীকত বুঝবে এবং সেসব আকীদাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে যা মুসলিমকে অমুসলিমদের থেকে পৃথক করে। ঈমানের অবস্থান এবং ঈমানের সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করবে, যেন এই নিআমতের হেফাযত, শোকর আদায় এবং এর উপর অবিচল থাকার ভাবনা জাগ্রত হয়। এমনটি না হলে তো ঈমানের দৃঢ়তা এবং ঈমানী মর্যাদাবোধ হারিয়ে যাবে। এটাই সর্বনিম্ন পরিণাম।

আমরা মুসলিম। ইসলাম হল, ঈমান ও আকীদা, শরীয়ত ও সুন্নতের সমষ্টি। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন এবং স্বতন্ত্র তাহযীব। ইসলামের আছে নিজস্ব পরিভাষা। প্রত্যেক পরিভাষার আছে নির্দিষ্ট মর্ম। সেই পরিভাষা, নাম ও মর্ম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত।

ইসলাম কী? ইসলামের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে অন্য সকল ধর্ম থেকে বিশিষ্ট করে? মুসলিম উম্মাহর অবস্থান ও মর্যাদা কী? আজ যেন আমাদের এর জ্ঞানই নেই অথবা এই বিষয়ের অনুভূতি নেই।

আজ আমরা সবচে বেশি যে সর্বনাশের শিকার তা হল, ঈমানের মর্যাদা ও মূল্য আমাদের জানা নেই অথবা –নাউযুবিল্লাহ– জেনে বুঝে সে নিআমতের অবমূল্যায়ন করছি। এজন্য দেখা যায়, ঈমান-পরিপন্থী কাজ, কথা, চিন্তা সবকিছুই খুব সহজে গ্রহণ করে নিচ্ছি। ইসলামের কালেমা এবং ঈমান-আকীদার সাথে তার কোনো বিরোধই অনুভূত হয় না।

এ সর্বনাশের প্রভাব হল, আমরা যেন ইসলামী পরিভাষা এবং পরিভাষার ইসলামী ব্যাখ্যা আলোচনা করতেও -নাউযুবিল্লাহ- লজ্জাবোধ করছি। পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় তা পেশ করারও যেন আমাদের সাহস নেই। শুধু এটুকু নয়, আমরা যেন নিজেদের ইসলামী পরিভাষার বদলে অন্যদের পরিভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখানেই শেষ নয়, এখন তো শাব্দিক সাযুজ্য অথবা মামুলি মিলের বাহানায় ইসলামী পরিভাষাকে অন্যদের চিন্তা ও চেতনার মর্ম পরানো হচ্ছে। যা ইসলামী আকীদা ও মূলনীতি বিকৃতির নিকৃষ্ট নমুনা। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অমুসলিমরা 'শান্তি' শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু একমাত্র শান্তিদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি এক, যাঁর কোনো শরিক নেই, যার এক নাম– আসসালাম–শান্তিদাতা, আলমুমিন–নিরাপত্তাদাতা–তার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর প্রতি ঈমান নেই। তাঁর সঙ্গে মহব্বত নেই। তাঁর অবতীর্ণ ইলমে ওহীর প্রতি বিশ্বাস নেই। এজন্য 'শান্তি'র যে ইসলামী মর্ম এবং যা শান্তির প্রকৃত মর্ম সে জ্ঞান থেকে তারা বঞ্চিত। এখন যদি কোনো

Scanned by CamScanner

মুসলিম তাদের সাথে সুর মিলিয়ে 'শান্তি' পরিভাষা ব্যবহার করে তাহলে এরচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা, নাশোকরি ও আত্মমর্যাদাহীনতা আর কী হতে পারে? এরপর যদি এই অর্থেই বলা হয়, ইসলাম শান্তির ধর্ম তাহলে এর চেয়ে বড় বিকৃতি আর কী হতে পারে?

তাদের শান্তির মধ্যে নাহী আনিল মুনকার-অসৎ কাজ থেকে বারণ করার নাম নিশানাও নেই। তাদের শান্তির মধ্যে সুদ কেবল বৈধ নয়, বরং সুদপ্রীতিও তাতে দাখেল। অথচ কুরআনের ঘোষণায় তা 'হারব'-আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা। তাহলে আল্লাহর কাছে যা 'হারব' ও যুদ্ধ তা তাদের কাছে 'সিলম' ও শান্তি। তাদের শান্তির মধ্যে তো খোদাদ্রোহীতাও অপরাধ নয়। এছাড়া আজকালের পশ্চিমা শান্তি তো আরো অনেক কিছু। তো কোনো মুসলিম কীভাবে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই পরিভাষা ব্যবহার করতে পারে? এরপর আবার কী করে সেই শব্দে ইসলামের পরিচয় পেশ করতে পারে?

মুমিনের দুআ ইবাদত, যা তাওহীদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনপূর্ণ স্থান। আল্লাহমুখিতা ও আল্লাহর উপর ভরসার বড় প্রকাশক্ষেত্র। কিন্তু কোনো মুমিন দুআতে কোনো মুশরিকের ইকতিদা করার প্রয়োজন মনে করলে, তার দুআয় কোনো মুশরিকের আমীন বলার প্রয়োজন মনে করলে এরচেয়ে আত্মমর্যাদাহীনতা এবং তাওহীদের পরিচয়ের ব্যাপারে অজ্ঞতা আর কী হতে পারে?

যে উম্মতের নবীকে আল্লাহ তাআলা জগতবাসীর জন্য রহমত বলে উপাধী দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

আমি আপনাকে জগতবাসীর জন্য কেবল রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। —সূরা আম্বিয়া (২১) : ১০৭

যে উম্মতের নবী খ্রিস্টান সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে লিখেছেন— أسلم تسلم ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে।

সেই উম্মতের কোনো সদস্যের যদি কোনো মুশরিক খ্রিস্টান থেকে শান্তির বার্তা আহরণ করার প্রয়োজন হয় তাহলে কোন্ ভাষায় তার জন্য আফসোস করব?

যার কাছে বিশ্বশান্তির বার্তাই নেই, যে ইসলামের মহাদৌলত থেকে বঞ্চিত, সে কীভাবে হতে পারে শান্তির পতাকাবাহী? তার মিথ্যা দাওয়াতে কীভাবে উৎসাহ পেতে পারে কোনো মুসলমান? কোনো মুমিন কীভাবে এমন পতাকাবাহীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারে? বিশ্বশান্তির বার্তা বহনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলসমাচারের আহ্বান! এত সুস্পষ্ট বৈপরীত্যও মুমিন ধরতে পারে না?! মুমিনের শান তো হল—

المؤمن لا يخدع ولا يخدع.

মুমিন প্রতারণা করে না, কারণ তার মধ্যে ঈমান আছে। মুমিন প্রতারিত হয় না, যেহেতু তার মধ্যে সঠিক বোধ আছে।

আজ সবচে বেশি প্রয়োজন, তাওহীদের বাস্তবতা উপলব্ধি করা এবং তাওহীদ-পরিপন্থী বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জন করা। যদি কোনো মুমিনের তাওহীদের বিশ্বাসের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা সহজে জায়গা করে নেয়, তার কাছে তাওহীদের সাথে এই কুফরী মতবাদের কোনো বৈপরীত্যই অনুভূত না হয়, তাহলে সে কোনো অমুসলিমকে তাওহীদের দাওয়াত দিবে কীভাবে? এমন অসম্পূর্ণ তাওহীদ তো অমুসলিমদের কাছেও আছে।

কারও তাওহীদের মাঝে যদি 'তাওহীদ ফিততাশরী'ই না থাকে অর্থাৎ সে যদি ধর্ম থেকে রাষ্ট্র পৃথক এই মতবাদের বক্তা হয় তাহলে এ নামের তাওহীদ তো পোপের কাছেও আছে। এমনকি তারা তো 'তাসলীস' তথা ত্রিত্ববাদকেও তাওহীদ নামে আখ্যায়িত করে!

মুমিনকে আল্লাহ তাআলা তাওহীদের কালেমা দান করেছেন। এরপর পুরো কুরআন জুড়ে এ কালেমার পরিপূর্ণ তফসীলও পেশ করেছেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্ঞানগত ও প্রয়োগগত শিক্ষার দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম এই আমানত তাবেঈদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন। এবং সব যুগের নবীর ওয়ারিস উলামায়ে কেরাম পূর্বসূরিদের থেকে শিখে পরবর্তীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। فاللهم لك الحمد ولك الشكر প্রয়োজন শুধু এটুকুই যে, এ শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং আপন করে নিতে হবে। আর নিজের মধ্যে তা প্রয়োগ করতে হবে।

আমাদেরকে জানতে হবে, ইসলাম মিল্লাতে হানীফিয়্যা তথা এক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ধর্মের নাম। সব ধর্ম ও ইসলামবিরোধী ইজম ও ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামকে আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসেবে কবুল করার মাধ্যমেই মানুষ মুসলমান হয়। ইসলামকে আর দশটি ধর্মের মতো একটি ধর্ম, আর দশটি জীবন-ব্যবস্থার মতো একটি ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার দ্বারা, এর কোনো একটি সৌন্দর্য আলোচনা করার দ্বারা না কেউ মুসলিম প্রমাণিত হয়, না মুমিন। যেমন, কেউ ইসলামকে এজন্য পছন্দ করে যে, তা শান্তি ও মানবতার ধর্ম এবং এদিক লক্ষ করেই সে ইসলামের সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করে। অথবা কোনো ব্যক্তি এমন যে, জীবনযাপনের জন্য কোনো ধর্ম বা সভ্যতাকে জরুরি মনে করে, যেহেতু ইসলামের মাধ্যমেও ধর্ম ও সভ্যতার কাজ হাসিল হয়ে যায় এজন্য সে ইসলাম গ্রহণ করে—এভাবেও সে কখনো মুসলমান হতে পারবে না।

এমনই বুঝতে হবে রাসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি। রাসূলকে শুধু ভালো মনে করা, শান্তির দূত, মহাপুরুষ অথবা শত মহাপুরুষের মধ্যে সর্বপ্রথম মনে করার নাম ঈমান নয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, তাঁকে আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী হিসেবে মানতে হবে। তার পবিত্র জীবনকে উসওয়ায়ে হাসানা—সর্বোত্তম আদর্শ মানতে হবে। তাঁর সুন্নাহকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে ঈমান মনে করতে হবে। তাঁর সামান্য অপমানকে কুফর বুঝতে হবে।

আমাদেরকে জানতে হবে, ইসলামই কেবল সত্যধর্ম। ইসলামই শান্তির নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হলেই অমুসলিমরাও শান্তি লাভ করতে পারে। অন্য কোনো ইজম, অমূলক ধর্ম, বিকৃত দ্বীন, তাদের শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না; শুধু দাবিই করতে পারে।

আমাদেরকে এও জানতে হবে, যার ধর্ম ভিত্তিহীন অথবা বিকৃত, যার শরীয়ত মানবরচিত, সে যা ইচ্ছা করতে পারে, যা ইচ্ছা বলতে পারে, যে কোনো পরিভাষা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মুসলমান, যার ধর্ম সত্য, যার ধর্ম সুসংরক্ষিত, যার ধর্ম স্থায়ী, যার কাছে আছে স্থায়ী শরীয়ত, যার দ্বীন-শরীয়তের উৎস ওহীর জ্ঞান (কুরআন ও সুন্নাহ) সংরক্ষিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে; সে হয়ে থাকে মর্যাদাশীল, গুরু-গম্ভীর, দায়িত্বশীল, সে হয়ে থাকে আমানত ও শাহাদাত বিশ্বস্ততা ও হকের সাক্ষ্যের বাহক। তার ধর্ম ইসলাম, যার বৈশিষ্ট্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ শব্দে ব্যক্ত করেছেন—

الإسلام يعلو ولا يعلى.

ইসলাম বিজয়ী হয়, বিজিত হয় না।

তাই ইসলামের অনুসারীর জন্য শোভা পায় না— যাচ্ছেতাই পরিভাষা ব্যবহার করা, যে কোনো শ্লোগানে কান দেওয়া। যে কারো পেছনে হাঁটা। আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনকে সব দিক দিয়ে পূর্ণতা দান করেছেন। এ দ্বীনকে অন্যের মুখাপেক্ষী ছেড়ে দেননি যে, তাঁর অনুসারীকে অন্যের

Scanned by CamScanner

পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে, অন্যের সভ্যতা অবলম্বন করতে হবে। মুসলিমকে সবসময় মনে রাখতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ইরশাদ–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

অর্থাৎ, যে কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদেরই একজন। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৩১

এখন মুসলমানদের মুখ থেকে 'আন্তধর্মীয় প্রার্থনা' এ শব্দও শুনতে হচ্ছে। একজন একত্ববাদী মুমিনের জন্য এ শব্দ কতটা অপরিচিত ও অচেনা তা আল্লাহই ভালো জানেন। কে না জানে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে এ ধরনের পরিভাষার দূরতম সম্পর্কও নেই। এটা তো তাওহীদের নিআমত থেকে বঞ্চিত অমুসলিমদের পরিভাষা। হ্যাঁ, ইসলামে একটি জিনিস আছে। তা হল, মুবাহালা। যার আলোচনা সূরা আলে ইমরানে এসেছে। এ সূরার ঐ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করুন এবং অর্থ নিয়ে ভাবুন–

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ [٥٩] اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ [٦٠] فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ [٦١] اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ [٦٢] فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ [٦٣] قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ [٦٤] يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ [٦٥] هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ [٦٦] مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ [٦٧] اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ [٦٨].

৫৯. আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত। আল্লাহ তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন, তারপর তাকে বলেন, 'হয়ে যাও'। ফলে সে হয়ে যায়।

৬০. সত্য সেটাই, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৬১. তোমার কাছে (হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা সম্পর্কে) যে প্রকৃত জ্ঞান এসেছে, তারপরও যারা এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়, (তাদেরকে) বলে দাও, এসো, আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে, আমরা আমাদের নারীদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নারীদেরকে, আর আমাদের নিজ লোকদেরকে এবং তোমাদের নিজ লোকদেরকে, তারপর আমরা সকলে মিলে (আল্লাহর সামনে) কাকুতি-মিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী তাদের প্রতি আল্লাহর লানত পাঠাই।

৬২. নিশ্চয়ই এটাই (ঘটনাবলীর) প্রকৃত বর্ণনা। আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৬৩. তথাপী যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোভাবেই জানেন।

৬৪. (ইয়াহুদী ও নাসারাদের) বলে দাও যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই রকম। (আর তা এই যে,) আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনও কিছুকে শরীক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে 'রব্ব' বানাব না। তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।

৬৫. হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছ, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তাঁর পরে নাযিল হয়েছে। তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না?

৬৬. দেখ, তোমরাই তো তারা, যারা এমন বিষয়ে বিতর্ক করেছ, যে বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান তোমাদের ছিল। এবার এমন সব বিষয়ে কেন বিতর্ক করছ, যে সম্পর্কে তোমাদের মোটেও জ্ঞান নেই। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না এবং খ্রিস্টানও নয়। বরং সে তো একনিষ্ঠ মুসলিম ছিল। সে কখনও শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৬৭. ইবরাহীমের সাথে ঘনিষ্ঠতার সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার লোক তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী (অর্থাৎ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সেই সকল লোক, যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।' –সূরা আলেইমরান (৩) : ৫৯-৬৮

৩ : ৬১ আয়াতে ইবতেহাল (মুবাহালা) এর কথা এসেছে। এই আয়াতের শানে নুযূল জানতে তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. দেখা যেতে পারে।

এ আয়াতগুলো নিয়ে ভাবতে থাকলে ইনশাআল্লাহ তাওহীদের বিশ্বাস দৃঢ় হবে। বুঝে আসবে, মুমিনের বিশেষ গুণ কী। বুঝে আসবে যে, মুসলিম মাত্রকেই এক আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হতে হবে। শুধু তার মুখের ভাষায় নয়, হৃদয় ও কর্মের ভাষাও এই হবে–

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ... اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ...

আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম, যিনি আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনও শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আনুগত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে আমি একজন।

এটাও জানতে পারবে, ত্রিত্ববাদীরা সবাই তাওহীদের নিআমত থেকে বঞ্চিত। তারা ঈসা আ. -এর মূল শরীয়ত ও শিক্ষা খুইয়ে বসেছে, তাঁর শিক্ষা থেকে সরে গিয়েছে। খোদ ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত পরিচয়ই তাদের কাছে নেই!

তাই ইহুদী-খ্রিস্টানদের মুক্তির একটিই পথ। আর তা হল, সব কুফরি থেকে মুক্ত হয়ে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা। তার উপর নাযিলকৃত কিতাব ও শরীয়ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা।

মুসলিম উম্মাহর মুক্তি ও সফলতা এই যে, তারা ঐ পথ পরিহার করে চলবে, যে পথ থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে সতেরো বার আল্লাহর কাছে সে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং সে পথে পরিপূর্ণরূপে উঠে আসবে, যে পথে পরিচালিত করবার জন্য প্রতিদিন আল্লাহর কাছে মিনতি করে, সে বলে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন। সে সকল লোকের পথে, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে। এবং তাদের পথেও নয়, যারা পথহারা। –সূরা ফাতেহা (১) : ৬-৭

হাদীসে এসেছে– اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (যাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে) হল, ইহুদী সম্প্রদায় এবং الضَّآلِّيْنَ (যারা পথহারা) হল, খ্রিস্টান সম্প্রদায়। ●

Scanned by CamScanner

জাগুক মুহাম্মাদ নামের দায়িত্ববোধ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

তুমি যদি মুহাম্মাদ হও, তবে এ নামের কোনও দাবি তোমার কাছে থাকে না কি? তোমার এ নাম কে রেখেছে? কেন রেখেছে? যার নামে তোমার এ নাম, তাঁকে তোমার ভাবার দরকার আছে না কি? নিশ্চয়ই যিনি তোমার এ নাম রেখেছেন, তাঁকে লক্ষ করেই তোমার এ নাম তিনি বাছাই করেছেন। তার এ বাছাইকরণের মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজন তোমার আছে না কি? ব্যাপারটা তো এমন নয় যে, আলটপকা তার মুখে এ নাম এসে গেছে অমনি রেখে দিয়েছেন। তিনি তোমার এ নাম ভেবেচিন্তেই রেখেছেন। তা তিনি কী ভেবেছিলেন? কাকে ভেবেছিলেন?

নিশ্চয়ই তিনি ভেবেছিলেন এ নামের একজনা এককালে এ দেশে জন্ম নিয়েছিলেন। জন্ম নিয়েছিলেন নিতান্তই গরীবের ঘরে। জন্ম নিয়েছিলেন এতিম হয়ে। বাবার মুখ দেখার নসীব তাঁর কোনওদিনই হয়নি। অভিভাবকত্ব পেয়েছিলেন দাদার। দাদাই কী ভেবে তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ'? মুহাম্মাদ মানে চরম প্রশংসিত। হ্যাঁ, সেই এতিম মুহাম্মাদ কালে এমনই কীর্তি জগৎসম্মুখে প্রদর্শন করেন, যা তাঁকে চরম প্রশংসিত করে তোলে সারা জাহানের মুখে। মানুষ নামের উপযুক্ত যে-কোনও ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য। সেই যে কীর্তি প্রদর্শনের কাল থেকে তাঁর প্রশংসা শুরু হয়েছে, তখন থেকে অবিরাম তাঁর প্রশংসা চলছে আরবে-আজমে, পূবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে, জলে-স্থলে, যমীনে-আসমানে– সর্বত্র সবখানে। তাঁর প্রশংসা করছে কালো আফ্রিকান, লাল ইউরোপিয়ান, সাদা রুশ ও ধূসর এশিয়ান।

তা কেন তাঁর এত প্রশংসা? কী এমন কীর্তি তিনি রেখে গেছেন জগৎসভায়? কী এমন তিনি করেছেন, যা জগতের প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে বাধ্য করছে তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে? তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে?

হ্যাঁ, মানুষ নামের এ জীব তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছে, তা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ছিল অভাবনীয়। আত্মকলহে জর্জরিত মানুষ কখনও কি ভেবেছিল, তারা সব দ্বন্দ্ব-কলহ ভুলে এক কাতারে একশা হয়ে যাবে? কখনও কি তারা ভাবতে পেরেছিল, বংশ-গোত্রের বিভেদ ঘুচে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে? এ কি কখনও চিন্তা করা সম্ভব ছিল যে, রক্ত ও বর্ণের বৈষম্য মুছে মনুষ্যত্বের মহিমায় সব মানুষ একাত্ম হয়ে যাবে? হ্যাঁ, যা ভাবা সম্ভব ছিল না, যা ছিল কল্পনার অতীত, মহান উম্মী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই বাস্তবে পরিণত করে দেখালেন। বু'আছ যুদ্ধের আগুন নিভে গেল। আওছ-খাযরাজ এক হয়ে গেল। বিলাল-সুহায়বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল। কে কুরায়শ, কে কুরায়শ নয় সে প্রশ্ন তিরোহিত হল। কে আরব, কে আজম এ প্রশ্ন ঘৃণ্য হয়ে গেল। বর্ণবৈষম্য জাহিলিয়ত সাব্যস্ত হল। সকলের জান, সকলের মাল ও সকলের ইজ্জত সমান মর্যাদা পেল। দুর্বল পেল শক্তিমানের আশ্বাস। শক্তিমান পেল দুর্বলের ভালোবাসা। সামাজিক মর্যাদায় ও রাষ্ট্রীয় সুবিধায় স্থাপিত হল সবার সমান অধিকার। গড়ে উঠল একটা জাতি।

এমন একটা জাতি, যারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাদের লক্ষবস্তু আখিরাত। তারা বিলাসিতাবিমুখ। তারা ত্যাগী; ভোগবাদী নয়। তারা বিদ্যানুরাগী। তারা নারীকে সম্মান দিতে জানে। তাদের নারী নিজ আসনটি চেনে। নিজের মর্যাদা বোঝে। তাদের নারী অনুপ্রেরণাদাত্রী। তারা তাদের শিশুদের তরবিয়ত করে। তাদের কোল শিশুর পাঠশালা। সেখানে হয় সোনার মানুষ গড়ার হাতেখড়ি। তাদের হাতেগড়া মানুষেরাই গড়েছে ইতিহাস। সত্যিকার মানুষের ইতিহাস। তারা জ্ঞান বিলিয়েছে জগদ্ব্যাপী। দূর করেছে অজ্ঞতার অন্ধকার। তারা মানুষকে মানুষের পূজা থেকে মুক্তি দিয়েছে। বস্তুবাদের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছে। মানুষের ভেতরে জাগ্রত করেছে মনুষ্যত্ববোধ। সর্বত্র ন্যায়ের নিশানা উড়িয়েছে। বিস্তার ঘটিয়েছে উদার-উন্নত চিন্তার। অনন্যসাধারণ এ জাতি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই মেহনতের ফসল।

তাঁর মেহনতের বদৌলতেই মানুষ পেয়েছে চলৎশক্তি। শিখেছে ভাবতে; দোজাহানের মুক্তির ভাবনা। মানুষ বুঝতে পেরেছে ভালোমন্দের তারতম্য। জানতে পেরেছে পাপ-পুণ্যের ফারাক। শুরু হল সৌন্দর্যের পথে অগ্রযাত্রা। আজ যেখানে যতটুকু ভালো, যতটুকু কল্যাণ তা সেই ছুটে চলারই অর্জন। তাই তো তিনি মুহাম্মাদ– সকলের প্রশংসিত। প্রশংসা তাঁর প্রাপ্যই বটে।

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতে যে সচলতা মানুষ লাভ করেছিল, তার অর্জন ছিল কতই না বিপুল, বিস্ময়কর! কিন্তু কালক্রমে তাঁর উপর পড়েছে নানা অপশক্তির কুনজর। ভেতর থেকেও লেগেছে ঘুণপোকা। এসেছে স্থবিরতা। ফলে সেই অর্জনে নতুন যোগ না হয়ে ঘটেছে নানামাত্রিক বিয়োগ। ফলে সেই মহান জাতিটির আজ এই ভগ্নদশা।

ওহে মুহাম্মাদ! সেই মহান নবী, সেই শ্রেষ্ঠ মানুষেরই নামে তোমার নাম। এ নামের সাথে জড়িয়ে আছে জাতিগঠনের ইতিহাস। মানবতার মুক্তির ইতিহাস। সকল বৈষম্যরেখা মুছে ফেলার ইতিহাস। পরবর্তীকালে সেই ইতিহাসের সাথে যোগ হয়েছে অনেক ভাঙচুরের কাহিনী। সেই ভাঙচুর কারা করেছে? শত্রুর কারসাজি আছে বৈ কি! কিন্তু ওই নামের যারা নিশানাবরদার, তারাও কি কম দায়ী? ভাঙচুরের হাতুড়ি-শাবল তো তারাই চালিয়েছে। কৃচ্ছ্রতার স্থানে বিলাসিতা কারা এনেছে? ত্যাগের স্থানে ভোগে কারা মেতেছে? সম্প্রীতির স্থানে দ্বন্দ্ব-কলহে শক্তিক্ষয় কারা করেছে? কারা দিলো ন্যায়-ইনসাফের জায়গায় জুলুম-নির্যাতনের প্রতিষ্ঠা?

দুনিয়াজুড়ে ইসলামী খেলাফতের গোড়াপত্তন করেছিলেন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শত-শত বছর তা চলছিল পূর্ণ শৌর্য-বীর্যে। সেই বিস্তীর্ণ শক্তিমান খেলাফত জরাগ্রস্ত হল। শেষে তা ভেঙে তছনছই হয়ে গেল। কে ধরাল তাতে জরা? কারা তা ভেঙে তছনছ করল? অন্যকে যতই দোষারোপ কর না কেন হে মুহাম্মাদ নামের ফেদায়ী, হাতুড়ি তো তোমরাই চালিয়েছ। তোমরা দিয়েছ জাতীয়তাবাদের শ্লোগান। তোমাদের উন্নাসিকতায় পেয়েছিল। নবী-শিক্ষা ছিল– আজমীর উপর আরবীর কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু তোমরা সেই শিক্ষা উপেক্ষা করেছ। মাঝখানে টেনে দিয়েছ আরব-আজমের ভেদরেখা। ভেঙে দিলে খেলাফত। তারপর নিজেরাও ভেঙে গেলে। তৈরী হল সৌদি

Scanned by CamScanner

আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান, ইয়েমেন, জর্ডান, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া আরও কত কী। একক শক্তি ভেঙে খণ্ড খণ্ড হল। তারপর তার এক খণ্ড আরেক খণ্ডের বিরুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করতে শুরু করল। কী পরিহাস! আপনার শক্তি আপনাতেই ক্ষয়।

শক্তিক্ষয়ের এই প্রতিযোগিতা কী হেতু? কেন আজ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধকলহ? কার স্বার্থে? যদি ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যেই হয়, তবে সে উদ্দেশ্য কি কোনওদিনই এর দ্বারা চরিতার্থ হয়, না হওয়া সম্ভব? ইতিহাস তো বলে, এর দ্বারা মূলত ক্ষমতার ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যায়। এ কলহ শত্রুকে পথ করে দেয়। বন্ধু সেজে শত্রু ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাই তো আজ বর্ণচোরা শত্রুদের খেলার ঘুটিতে পরিণত প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেশ।

ওহে অদ্যকারের মুহাম্মাদ! তোমার তো সে কথা না বোঝার কারণ নেই। তুমি আজ কাকে বন্ধু বলে গলায় জড়াচ্ছ? প্রিয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুকে? তাঁর গড়ে যাওয়া জাতির শত্রুকে? তারা কেমন শত্রু, কী তাদের চরিত্র, সারা কুরআনেই তা চিত্রিত করা হয়েছে। আহা! কুরআন নাযিলের দেশ আজ কাদের স্বাগতিক? কুরআনের শত্রুদের নয় কি? যারা ভূপৃষ্ঠ থেকে কুরআন মুছে দিতে চায়, কুরআনের শিক্ষা মানুষকে ভুলিয়ে দিতে চায়, কুরআনবিরোধী কালচার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চায়, কুরআন নাযিলের দেশে শত্রুসভ্যতার প্রতিষ্ঠা যাদের স্বপ্ন, তাদের কিনা আজ বন্ধুর ভেক আর তাদের কুটচালে বন্দী হয়ে আজ তোমার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা!

নিজ দেশে আজ তুমি কার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছ? অনেক অবক্ষয়ের পরও আমাদের একটা সান্ত্বনার জায়গা ছিল। অন্তত্পক্ষে প্রিয়নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদেশে কিছুটা হলেও তাঁর শিক্ষা মেনে চলা হচ্ছে। এখানকার সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে এবং এখানকার সমাজে ও রাষ্ট্রনীতিতে তাঁর আদর্শের কিছুটা ছাপ আছে। ওই ছাপটুকুর কারণে শত্রুরা নাখোশ ছিল। চারদিকে সমালোচনা ছিল। অন্ধকার যুগের আঁধারচ্ছন্ন দেশ বলে গাল দেওয়া হচ্ছিল। এ যাবৎকাল তাদের সেই অখুশি ও সমালোচনা আমাদের খুশি করত। কারণ শত্রু সমালোচনামুখর হলে ভাববার সুযোগ থাকে আমরা সঠিক আছি। কিছুটা হলেও আমরা জায়গামত আছি। এখন সেই সমালোচনা কমছে। তা কমারই কথা। কারণ আদর্শের অবশেষটুকুও আজ নিজ হাতে মুছে ফেলা হচ্ছে। ওদের মত আমাদেরও ঘরভাঙার আয়োজন চলছে। আমাদের নারীর যে মর্যাদার জায়গা ছিল, সেখান থেকে তাদের উৎখাতের পালা যখন শুরু হয়ে গেল, তখন ঘর ভাঙার বেশি দেরি নেই। ঘর ভেঙে গেলে আর কোনওকিছুই ভাঙার বাকি থাকবে না। এক-এক করে সেই ভাঙা স্থানে পশ্চিমাদের সবকিছুই এসে জুড়ে বসবে। তখন নবীপ্রেমিকদের অন্তরে কেবল রক্তক্ষরণই হবে, কারও সান্ত্বনার কোনও জায়গা থাকবে না।

নির্দেশ ছিল, তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদের বন্ধু বানিও না। কারণ ওদের বন্ধু বানানোর পরিণাম নিজের সবকিছু থেকে হাত ধুয়ে ফেলা। শুরুটা হয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ থেকে। সেই শুরু কার্যত হয়েই গেছে। তারপর ক্রমে আইন-কানূন, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা সবকিছুই অন্ধঅনুকরণের শিকার হয়ে যায়। পরিশেষে সমগ্র জাতিসত্তা তথাকথিত বন্ধুজাতির ভেতর বিলীন হয়ে যায়। ছদ্মবেশী বন্ধুদের তো সেটাই কাম্য। সেই লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত তারা সন্তুষ্ট হওয়ার নয়। কুরআন তো বলেই দিয়েছে–

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.

ইহুদী ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। –সূরা বাকারা (২) : ১২০

তাই এ আত্মঘাতী অনুকরণ তুমি কিভাবে করতে পার, যখন তোমার কাছে রয়ে গেছে সম্মানজনক জীবনের পথনির্দেশ? সেই পথনির্দেশের অনুসরণ করে তোমার পূর্বসূরিরা রচনা করেছিল গৌরবময় ইতিহাস। সে এক পথনির্দেশই বটে। তার অনুসরণে ইতিহাসের গৌরবই রচিত হয়। তার বিকল্প খোঁজার মত আত্মপ্রবঞ্চনা হয় না। কারণ সে যে আল্লাহর পথনির্দেশ। আর إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى 'প্রকৃত পথনির্দেশ তো আল্লাহরই পথনির্দেশ'। এর বাইরে কল্যাণ ও মুক্তি এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধি খুঁজতে গেলে তাতে কেবল বিভ্রান্তিই বাড়তে পারে–

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلُ.

সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে? –সূরা ইউনুস (১০) : ৩২

গোটা জাতিকে নিয়ে সেই বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খাওয়ার জোগাড় হচ্ছে না তো? তখন তুমি কার সাহায্য পাবে? আল্লাহর হিদায়াত উপেক্ষা করে আল্লাহর সাহায্য লাভের তো আশা করা যায় না। ইয়াহূদ-নাসারার অনুকরণ করার সর্বাপেক্ষা বড় কুফল তো আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া। কুরআনের ঘোষণা–

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ.

তোমার কাছে (ওহীর মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনও অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না। –সূরা বাকারা (২) : ১২০

অনুকরণপ্রবণতা মানুষকে মেরুদণ্ডহীন করে তোলে। কিংবা বলা যায়, মেরুদণ্ডহীন লোকই অন্যের অনুকরণ করে। ফলে সে এমন এমন কাজ করে বসে, যাতে লাজলজ্জার বালাই থাকে না। আজ ইহুদীদের সংগে গাঁটছড়া বাঁধা কি সেই লজ্জাহীনতারই নগ্ন প্রকাশ?

সন্দেহ নেই খোমিনীর ইরান এক পুরানো শত্রু। শিয়া সম্প্রদায় তার জন্মের শুরু থেকেই ইসলামের সাথে শত্রুতা করে আসছে। বরং তার জন্মই ইসলামবিদ্বেষ থেকে, তা সে মুখে যতই ইসলামের নাম নিক না কেন। মহান আবূ বকর রা.-কে যে ঘৃণা করে, সে ইসলামের শত্রু নয় তো কি? ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.-এর মত ভূমিকা আর কার আছে? এ উম্মতের দ্বিতীয় মহান ব্যক্তি খলিফা উমর রা.। তাঁর প্রতি যার বিদ্বেষ, সে কতটুকু মুসলিম? মহিয়সী মা আয়েশা সিদ্দীকা রা.। তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্নকে কে বলে মুসলিম? সাহাবীদের গোটা জামাতকেই যারা বেঈমান ঠাওরায় (নাউযুবিল্লাহ), তারাও বুঝি ঈমানদার? ঈমানদার তারা নয়, এটাই স্পষ্ট। তাই তো তারা চিরদিন ঈমানদারদের সাথে শত্রুতা করে আসছে। বাগদাদে সর্বপ্রথম ধ্বংসযজ্ঞ চলেছিল ওদেরই মদদে। হালাকুখানের সেই ধ্বংসলীলা কোনও মুসলিমের পক্ষে কি ভোলা সম্ভব?...

ইসলামের এই ঘোরতর শত্রু ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে চিরদিন শত্রুতা করে যাবে এটাই স্বাভাবিক। তারা ইরাকে, বাহরাইনে, লেবাননে, ইয়েমেনে যখন যেখানে সুযোগ পাবে, সেখানেই ঘোট পাকাবে, দাঁত বসাবে, থাবা বিস্তার করবে। থাবা বিস্তার তারা করেই যাচ্ছে। সেই লক্ষ্যে করছে উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি। কাজেই তাদের ব্যাপারে নীরব-নিশ্চুপ বসে থাকার সুযোগ নেই। শত্রুকে শত্রুই গণ্য করতে হবে, তাতে যে যাই মনে করুক না কেন। তাদের

ব্যাপারে বিচক্ষণতা ও হুঁশিয়ারীর সাথে বাস্তবমুখী পদক্ষেপও গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে অবহেলার কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে তো অপর শত্রু অভিশপ্ত ইহুদীদের সাথে দোস্তী করা চলে না।

ওহে মুহাম্মাদ! তুমি আজ দুই শত্রুর মাঝখানে। একদা প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও দুই শত্রুর মাঝখানেই ছিলেন। আজ যেমন একদিকে ইরান অপরদিকে ইসরাঈল, তেমনি সেদিনও দুই দিকে দুই শত্রু ছিল, যদিও সেই দুই শত্রুর রূপ ছিল সময়ভেদে বিভিন্ন। একসময় মদীনার ইহুদী ও মক্কার পৌত্তলিকগণ। পরে ইরানের মাজূসী ও রোমের খৃষ্টানগণ। স্বতন্ত্র কোনও রাষ্ট্রের মালিক না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী ইহুদীরা ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে হামেশাই তৎপর ছিল। সেই হিসেবে লড়াই ছিল এই ত্রিশত্রুর বিরুদ্ধে, যদিও বড়-বড় যুদ্ধগুলি বৃহত্তম দুই শক্তির সাথেই হয়েছে। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরে সাহাবীগণ কোনও শত্রুর সংগেই আপোষ করেননি। হিজায ভূমিতে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিমগণ দু'দিকের বৃহৎ দুই শক্তির বিরুদ্ধে লড়েছে। পূবদিকে হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস রা.-এর নেতৃত্বে ইরানীদের বিরুদ্ধে লড়াই চলেছে, তো পশ্চিমে বোঝাপড়া চলেছে হযরত আবূ উবায়দা রা.-এর নেতৃত্বে রোমানদের সংগে। ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে রোমানদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে আর কাদেসিয়ার যুদ্ধে মেরুদণ্ড ভাঙে ইরানীদের। একই সংগে এতবড় দুই শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ইসলামী খেলাফত হতোদ্যম হয়নি। মুসলিম জাতি ও তাদের খলিফা বিন্দুমাত্র হিম্মত হারায়নি। আল্লাহর প্রতি ছিল তাঁদের পূর্ণ আস্থা। নিজেদের ঐক্য ও সংহতি রেখেছিল অটুট। ক্ষমতার মোহ ও ইহজীবনের আসক্তি তাঁদের স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁদের ছিল ইখলাস। ছিল আল্লাহর ভয় ও আখিরাত অভিমুখিতা। আর সেটাই ছিল তাঁদের হিম্মত ও মনোবলের উৎস। ফলে একইসংগে তাঁরা লড়তে পেরেছেন সকল শত্রুর বিরুদ্ধে।

একইসংগে উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া আজও সম্ভব। দরকার শুধু ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করা। দরকার ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়া। এই শর্তে উত্তীর্ণ হতে পারলে না ইরানকে তোয়াক্কা করা দরকার আছে, না প্রয়োজন আছে ইসরাঈলের সাথে বন্ধুত্বের। ইসরাঈল বা ইহুদীদের সাথে বন্ধুত্ব– এর মত অশ্রাব্য ভাষা আর কি হতে পারে? আজ সেই ভাষাও আমাদের উচ্চারণ করতে হয়! কোথা-কোথা থেকে এই ভবঘুরে অভিশপ্ত জাতি ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে এসে জুড়ে বসেছে। তারা এখানকার মূল বাসিন্দা ফিলিস্তিনী জাতিকে বাস্তুচ্যুত করে নিজেদের বসতবাড়ি তৈরি করেছে। গড়েছে একটি আগ্রাসী রাষ্ট্র। ফিলিস্তিনের বিস্তৃত ভূমি তাদের আগ্রাসনের শিকার। তাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার লক্ষ-লক্ষ ফিলিস্তিনী। বছরের পর বছর তারা নিরীহ-নিরস্ত্র মুসলিমদের হত্যা করছে। নির্বিচারে খুন করছে নারী ও শিশুদের। সেই রক্তপিপাসু হায়েনাদের সংগে দোস্তী করবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনও অনুসারী? তারা তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই চেষ্টা তারা করেছিল বার বার। তাঁকে বিষপান পর্যন্ত করিয়েছিল। ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র চালিয়েছে অব্যাহতভাবে। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে যখন ইসলামের দিগ্বিজয় চলতে থাকে, বাহ্যত সমরশক্তিতে তাদের প্রতিরোধ করা যখন অসম্ভব মনে হতে থাকে, তখনও এই অভিশপ্ত জাতিটি নীরব বসে থাকেনি। আব্দুল্লাহ ইবন সাবা'র নেতৃত্বে তৈরি করেছে ফিতনাবাজ 'সাবাঈ বাহিনী'। এ বাহিনীটি মুসলিম জাহানে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপতৎপরতা চালায়। তাদের দুর্বৃত্তপনার শিকার হতে হয় মহান খলিফা হযরত উছমান যুন-নূরায়ন রা.-কে। তাঁকে শহীদ করে দেওয়ার পর চেষ্টা করে মুসলিম জাতির ভেতর বিভিন্ন দল-উপদল তৈরীর ও তাদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টির। তৈরি হয়ে যায় 'খারিজী' নামক এক উগ্রপন্থী দলের। তৈরি হয় শিয়া ও রাফিযী নামক এক বর্ণচোরা সম্প্রদায়। সেই শুরু ইসলামের ভেতর ফেরকাবাজী বিশৃংখলার। এ বিশৃংখলার বীজ ইহুদী চক্রেরই বোনা, নিজেদের জান-মাল দিয়ে শত-শত বছর যাবৎ যার মাশুল এই মুসলিম জাতিকে দিতে হচ্ছে। এহেন চক্রান্তকারী জাতির সাথে গাঁটছড়া বাঁধা কখনও কি কোনও মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায়? আবার সেই ব্যক্তি যদি হয় 'মুহাম্মাদ' নামের কেউ?

হ্যাঁ, নামের একটা দায় থাকেই। কারও নাম এমনিতেই রেখে দেওয়া হয় না। নামের পেছনে থাকে একটা লক্ষ্য, একটা স্বপ্ন। সেই লক্ষ্য ও স্বপ্ন পূরণে যত্নবান না থাকলে নামকরণ বৃথা হয়ে যায়। উদাহরণত যার নাম 'আব্দুস সামাদ (বেনিয়াজ আল্লাহর বান্দা), সে যদি কোনও সৃষ্টির কাছে হাত পাতে তবে তার এ নামের কোনও সার্থকতা থাকে কি? প্রকারান্তরে তাতে এ নামের অমর্যাদা হয়। অনেক সময় নাম রাখা হয় কোনও মহান ব্যক্তির নামে। আশা থাকে শিশুটির উপর কালে ওই মহান ব্যক্তির ছায়া পড়বে। কিছুটা হলেও তার মত হবে। কিন্তু বাস্তবে যদি বিপরীত হয়, তবে কি ওই নামটি তার জন্যে তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না? যেমন কারও নাম রাখা হল আবুদ-দারদা (হযরত আবুদ-দারদা ছিলেন একজন দুনিয়াবিমুখ সাহাবী), এখন ওই ব্যক্তি যদি হয় দুনিয়ালোভী তবে এই নামটি তার পক্ষে পরিহাস নয় তো কি? কারও নাম রাখা হল বীর সাহাবী হযরত খালিদ রা.-এর নামে। এই লোকটি যদি হয় ভীরু, তবে তার পক্ষে ওই নাম কতটুকু সার্থক হল?

নামকে সার্থক করে তোলার দায় মূলত প্রত্যেকের উপরই থাকে। যারই যেই নাম রাখা হয়ে থাকে, সে নামের দাবি– ব্যক্তিটি যেন তার সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। তাই হাতেম নামধারীর উচিত কিছুটা হলেও দান-খয়রাতে মন দেওয়া। উমর ফারূক যার নাম, তার কর্তব্য সত্য-ন্যায়ে আপোষহীন থাকা। মুজাহিদ নামক ব্যক্তির দায় থাকে, আল্লাহর পথে সংগ্রামে অবিচল থাকা। অনুরূপ আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, ইবরাহীম, ইসমাঈল, আবূ বকর, আবূ হুরায়রা, তাহের, তায়্যিব প্রভৃতি নামের কিছু না কিছু দায় ও দাবি আছেই– তা নামের অর্থের দিক থেকে হোক কিংবা কোনও মহান ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের দিক থেকে। অনেক সময় তা থাকে উভয় দিক থেকেই, যখন নামটি হয় তাৎপর্যপূর্ণ, সুন্দর অর্থবোধক, সেইসংগে তা হয় কোনও মহান ব্যক্তির নামে। সেই ধারার শ্রেষ্ঠতম নাম 'মুহাম্মাদ'। অর্থ ও ব্যক্তিত্ব, উভয়দিক থেকেই এ নামটি তুলনাহীন। সুতরাং এ নামে যার নাম হবে, তার দায় বড় কঠিন। তার এমন কোনও কাজ করা চলবে না, যা তাকে নিন্দিত করতে পারে। কারণ সে তো মুহাম্মাদ– চরম প্রশংসিত। তার দৃষ্টি থাকবে সর্বদা প্রশংসনীয় কাজেরই দিকে। তার পক্ষে বাঞ্ছনীয় এমন এমন কাজে মশগুল থাকা, যা একদিকে আল্লাহর প্রশংসা কুড়াবে, অন্যদিকে মানুষের কাছে তাকে করে তুলবে সমাদৃত। আবার এ নাম যেহেতু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নামে, তাই তাকে এ নামের ইজ্জত রক্ষা করতেই হবে। তাকে হতে হবে

(বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়)

Scanned by CamScanner

দুআয়ে মাগফিরাতের আবেদন

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

বিগত কয়েক মাসে অনেক উলামা-মাশায়েখ ইনতিকাল করেছেন। পাঠকবৃন্দের কাছে তাঁদের সকলের জন্য দুআয়ে মাগফিরাতের দরখাস্ত করছি।

১. গত ১৪ সফর ১৪৩৯ হিজরী/৪ নভেম্বর ২০১৭ ঈসাব্দ শনিবার দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার প্রবীণ উস্তায হযরত কাতেব ছাহেব হুযূর ইনতিকাল করেছেন। হযরতের নাম ছিল সুলাইমান আরমান। তবে সবার কাছে তিনি কাতেব ছাহেব হুযূর নামেই পরিচিত ছিলেন। হস্তলিপি, 'শের' রচনা ও আবৃত্তি ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততা। শুনেছি, ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৯৭ বছর। রাহিমাহুল্লাহু তাআলা রাহমাতান ওয়াসিয়া।

২. হাফেয মাওলানা যাকারিয়াও গত ২০ নভেম্বর ২০১৭ ঈসাব্দ সোমবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে আখেরাতের সফরে রওয়ানা হয়ে গেছেন। মিরপুর আরজাবাদ মাদরাসায় তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। পরবর্তীতে পল্লবী আফতাবুদ্দীন মাদরাসার যিম্মাদার ছিলেন। তার মূল পরিচয় ছিল, তিনি ধানমণ্ডি সাত নম্বরের বড় মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন।

তাঁর আব্বাজান ডক্টর ইসহাক ছাহেবের ইনতিকালের পর আমার অনুরোধে তিনি তাঁর আব্বাজানের উপর সংক্ষিপ্ত একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে প্রবন্ধ আলকাউসারে প্রকাশিত হয়েছিল।

কয়েক বছর যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। আফসোস! আমার খেয়াল হয়নি, নয়তো তাঁর কাছ থেকেই তাঁর আত্মজীবনী শুনে হেফাযত করতাম। কারণ, দেশ বিদেশের অনেক উলামা-মাশায়েখের সঙ্গে তাঁর মুলকাত হয়েছিল। জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউনেও তিনি দরস হাসিল করেছেন। সেখানে হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইউসূফ বানূরী রাহ.-এর সাহচর্যেও ধন্য হয়েছেন। একবার তিনি বলেছিলেন, 'আহসানুত তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম' কিতাবটি আমি সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী রাহ.-এর কুতুবখানায় দেখেছি।

হাফেয মাওলানা যাকারিয়া রাহ. ও তাঁর আব্বার কুতুবখানায় অবশ্যই দুর্লভ কিছু কিতাব থাকবে। আল্লাহ তাআলা এই কুতুবখানাটির হেফাযত করুন।

৩. হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (নানূপুরী হযরত)-এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা ইউসূফ ছাহেব, মুহতামিম, দারুল উলূম শাহ নগর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। তিনিও গত ১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী/৭ ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসাব্দ বৃহস্পতিবার আখেরাতের মুসাফির হয়ে গেছেন। এমনিতে তো কয়েকবার হযরত থেকে ইসতিফাদার সুযোগ হয়েছে। তবে গত বছর তাঁর মাদরাসার অদূরে অবস্থিত বাড়িতে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

তিনি একসময় জামিয়া কোরআনিয়া লালবাগে পড়াশোনা করেছেন। সেসময় হযরত সদর ছাহেব রাহ. তাঁকে একবার চিল্লায় পাঠিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত এই ধারার তাবলীগী খেদমতের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তালীম, সুলূক ও ইহসান, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং ওয়ায ও বয়ান এই সব ধরনের দ্বীনী খেদমতের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল। এই সব ধরনের কাজেই তিনি অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর প্রতি নানুপুরী হযরতের অনেক আস্থা ছিল। তাঁর নসীহত খুবই মূল্যবান হত। এক নসীহত তো একেবারে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। তিনি বলতেন, ইজাযতনামা মূলত তাসাওউফের মকতবের ভর্তি ফরম। মকতবে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয়ে গেল, তাই যেমন শোকর আদায় করা উচিত তেমনি মজবুতভাবে মেহনত অব্যাহত রাখা উচিত। নতীজা তো সামনে, মৃত্যুর সময়। সুন্দর মৃত্যু হয় কি না। এমনিভাবে নতীজা প্রকাশ পাবে কবরে, হাশরে এবং আখেরাতের অন্যান্য ঘাঁটিতে।

৪. সিলেট দরগাহ মাদরাসার সাবেক উস্তাযে হাদীস হযরত মাওলানা আবদুল বাসেত বরকতপুরীও দুনিয়া থেকে চলে গেছেন।

২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী/১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসাব্দ শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর ইনতিকাল হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি দরগাহ মাদরাসায় তাদরীসের খেদমতে ছিলেন। সেখানেই দুইবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়েছে। পরে জানতে পেরেছি, তিনি হযরত বানূরী রাহ.-এর শাগেরদ। জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বানূরী টাউনে তিনি পড়াশোনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাগফিরাত নসীব করুন। তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন– আমীন।

৫. বেশ পরে জানতে পেরেছি, চৌধুরীপাড়া মাদরাসার জোয়ান উস্তায মাওলানা মুতীউর রহমান ছাহেবও আর এই দুনিয়ায় নেই। জানতে পেরেছি, গত ৩ যিলহজ্ব ১৪৩৮ হিজরী/২৬ আগস্ট ২০১৭ ঈসাব্দ শনিবারে তিনি আমাদেরকে রেখে চলে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভরপুর মাগফিরাত নসীব করুন। তাঁর পরিবার পরিজনের যিম্মাদার হয়ে যান– আমীন।

৬. গত ২৪ সফর ১৪৩৯ হিজরী সোমবারে কারী তায়্যিব রহ.-এর ছাহেবযাদা হযরত মাওলানা আসলাম কাসেমী রাহ. ইনতিকাল করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ ওয়াক্ফ-এর নায়েবে তালীমাত ছিলেন। তাঁর অনূদিত ও রচিত কয়েকটি কিতাবও রয়েছে। সীরাত ও তারীখ তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল।

শুনেছি মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁর দাফন হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরে রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন।

৭. ডক্টর মুস্তফা আজমী রাহ.। গত বুধবার সকালে তিনিও পরপারে চলে গেছেন। তিনি ২ রবিউল আউয়াল (আমাদের এখানের চাঁদের হিসাবে ১লা রবিউল আউয়াল) মুতাবেক ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসাব্দ তারিখে রাব্বে কারীমের সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

তাঁর সঙ্গে পরিচয় তাঁর ইলমী কাজগুলোর মাধ্যমে। তিনি 'সহীহ ইবনে খুযাইমা' ও 'সুনানে ইবনে মাজাহ'র তাহকীক ও তালীকের কাজ করেছেন। তাঁর কিতাব 'মানহাজুন নকদ ইনদাল মুহাদ্দিসীন' সমষ্টিগত বিচারে ভালো কিতাব। এছাড়া 'দিরাসাতুন ফিল হাদীসিন নাবাবিয়্যি ওয়া তারীখি তাদভীনিহী'ও মাশাআল্লাহ এক ঐতিহাসিক 'দলীল'। ইসতিশরাকের ফিতনা মোকাবেলায় এই উভয় কিতাবে অনেক ভালো তথ্য রয়েছে। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. 'তাহকীকু ইসমাইস সাহীহাইন ওয়াসমি জামিইত তিরমিযী'তে জামে তিরমিযীর সেই গুরুত্বপূর্ণ নুসখার কথা উল্লেখ করেছেন, যা আজমী ছাহেবের কাছে সংরক্ষিত ছিল। আল্লাহ তাআলা যেন নুসখাটি হেফাযত করেন, যাতে তলাবা ও উলামায়ে কেরামের সেখান থেকে ইসতিফাদার সুযোগ হয়।

আজমী রাহ.-এর জন্ম ১৩৫০ হিজরী/১৯৩২ ঈসাব্দতে। তিনি হযরত মাদানী রাহ.-এর শাগরেদ ছিলেন। খুব সম্ভব ১৩৭২ হিজরীতে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে দাওরায়ে হাদীসের তালিবে ইলম ছিলেন। মনে পড়ছে, আমাকে খতীব ছাহেব রাহ. (হযরত মাওলানা উবাইদুল হক রাহ.) বলেছিলেন, তিনি হযরত আজমী ছাহেব রাহ.-এর সহপাঠী ছিলেন।

মাওলানা যুবায়ের আশরাফ ছাহেব আমাকে বললেন, খতীব ছাহেব রাহ.-এর দাওরা হয়েছে ১৩৬৬-৬৭ হিজরী শিক্ষাবর্ষে। তো হতে পারে তাঁরা কোনো কিতাবে সহপাঠী ছিলেন। কারণ, সেসময় জামাত ভিত্তিক পড়ার ব্যবস্থা কড়াকড়িভাবে চালু হয়নি।

উল্লেখ্য, আজমী রাহ. মূলত হিন্দুস্তানের হলেও তাঁর কর্মজীবনের বড় অংশ সৌদি আরবের রিয়াদে কেটেছে।

আল্লাহ তাআলা আখেরাতের সকল মুসাফিরকে ভরপুর মাগফিরাত নসীব করুন। তাঁদের দারাজাত বুলন্দ করুন। তাঁদের উত্তরসূরিদের সবরে জামীলের তাওফীক দান করুন– আমীন। –আবদুল মালেক

Scanned by CamScanner

স্মরণ রাখুন কর্মের লক্ষ্য, জীবনের উদ্দেশ্য

মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

আমরা সবাই চাই অর্থপূর্ণ জীবন। অর্থহীন জীবন কারোরই কাম্য নয়। কিন্তু কীভাবে জীবন অর্থপূর্ণ হয় এ বিষয়ে অনেকের সঠিক ধারণা নেই। আল্লাহ তাআলার অপার করুণা, ইসলামের শিক্ষার দ্বারা তিনি আমাদের দান করেছেন অর্থপূর্ণ জীবনের সংজ্ঞা ও সন্ধান। আর একমাত্র তাঁরই তাওফীকে আমরা পরিচালিত হতে পারি সফল-সার্থক জীবনের পথে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

জীবন তো আর কিছু নয়, বিশ্বাস ও কর্মের সমষ্টি। জীবন অর্থপূর্ণ হওয়া মানে কর্ম ও বিশ্বাস অর্থপূর্ণ হওয়া। কাজেই অর্থপূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে হলে অর্থপূর্ণ কাজ করতে হবে।

অর্থপূর্ণ কাজ কি খুব কঠিন? আমার মাঝে কি নেই ভালো কাজের যোগ্যতা? এই সব প্রশ্নের আবর্তে পাক না খেয়ে চলুন আমরা বিষয়টি সহজভাবে চিন্তা করি। অর্থাৎ মহৎ ও অর্থপূর্ণ কাজ উদ্ভাবন করার বদলে আমরা আগে চিন্তা করি, সচরাচর যে কাজগুলো করে থাকি সেগুলোকেই কীভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলা যায়।

প্রতিদিন কত কাজই তো আমরা করি, যেসবের ব্যাপারে আলাদা চিন্তার গরজও বোধ করি না। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-বিশ্রাম, চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা-কাটা, পড়া-শোনা, দেখা-সাক্ষাৎ, স্ত্রী-সন্তানকে সময় দেওয়া ইত্যাদি আরো কত কী। এসব আমাদের নিত্যদিনের কর্ম। বলা যায়, কর্মের এই চক্রেই আমাদের জীবন ও সময় আবর্তিত; জীবনের সিংহভাগ নিঃশেষিত। একবার ভাবুন দেখি, জীবনের এই প্রাত্যহিক কাজগুলোকেই যদি অর্থপূর্ণ করে তোলা যায় তাহলে কত সহজেই না আমাদের জীবন হয়ে উঠতে পারে অর্থপূর্ণ, মহিমাপূর্ণ!

কিন্তু কী সে উপায়, যার দ্বারা এই সকল কাজও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে? সেই উপায়টি হচ্ছে, কর্মের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ঠিক করে নেওয়া। জী, সহীহ নিয়ত, তথা সঠিক উদ্দেশ্য ও নির্ভুল প্রেরণার দ্বারা আমাদের প্রাত্যহিক কাজগুলোও পেতে পারে আলাদা মাত্রা; জীবনের ছোট-ছোট কাজগুলোও হয়ে উঠতে পারে মহিমাপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ।

জীবনকে অর্থপূর্ণ করার এ এক বিকল্পহীন ব্যবস্থা, অন্যদিকে তা এক সহজ স্বাভাবিক উপায়ও বটে। কারণ প্রাত্যহিক কাজগুলোকে তো জীবন থেকে ছাঁটাই করা যাবে না, সে চিন্তা সমীচীনও নয়। তাহলে যে পথে এই কাজগুলোও তাৎপর্যপূর্ণ ও কল্যাণপূর্ণ হয় সে পথই অন্বেষণ করা যুক্তিযুক্ত। আর তা হচ্ছে, কর্মের লক্ষ্য ও জীবনের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এবং সকল কাজে তা চেতনায় জাগ্রত রাখা।

এই উপায় অবলম্বনের দ্বারা অতি সাধারণ একজন মানুষও উঠে যেতে পারেন সফলতার শিখরে, পেয়ে যেতে পারেন ব্যর্থতার গ্লানি থেকে নাজাত ও মুক্তি।

এই মহান শিক্ষাই দান করেছেন আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই বিখ্যাত বাণীতে–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

কর্মসমূহ তো নিয়তেরই সাথে। আর প্রত্যেকের জন্য আছে তা-ই যার সে নিয়ত করে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১

মানুষের জীবন জুড়ে যত কাজ, যত প্রকারের কর্ম, তার পরিচয় ও পর্যায় নির্ণিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিয়তের রয়েছে গভীর ভূমিকা। দু'জনের বাহ্যত অভিন্ন কর্মও সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায় নিয়তের কারণে। নিয়তের এই প্রভাব পরিব্যাপ্ত আমাদের জীবনের সকল কর্মে। আহার-নিদ্রার মতো একান্ত ব্যক্তিগত কাজ থেকে শুরু করে বিয়ে-শাদী, জীবিকা উপার্জন, পরিবারের ভরণ-পোষণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন, দাওয়াত-জিহাদ, ইবাদত-বন্দেগী পর্যন্ত সবকিছুই নিয়তের বিধান ও প্রভাবের অধীন। বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে জীবনের সকল কাজ পরিণত হয় নেক আমল ও ছাওয়াবের কাজে। পক্ষান্তরে অন্যায় অশুদ্ধ নিয়তের কারণে ইবাদত-বন্দেগী ও বাহ্যত দ্বীনী কাজগুলোও হয়ে যায় অর্থহীন, মূল্যহীন; বরং শাস্তি ও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

কাজেই জীবনকে সফল ও অর্থপূর্ণ করার প্রথম উপায় হচ্ছে, প্রতিটি কাজের নিয়ত ও উদ্দেশ্য ঠিক করা। আর এটাই হচ্ছে মুমিন-জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কুরআন মাজীদের ইরশাদ–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনও শরীক নেই আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আনুগত্য স্বীকারকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। –সূরা আনআম (৬) : ১৬২

এই যে কুরআনী শিক্ষা– 'আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য', এতেই আছে জীবনের সকল কর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বর্ণনা।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. এক জায়গায় এই আয়াতের ভাব ও মর্ম এভাবে বয়ান করেছেন–

'মুমিন-জীবনের বিভিন্ন অংশ পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়; বরং তা একটি একক, যার সকল অঙ্গে বিরাজমান ইবাদতেও ছওয়াব প্রত্যাশার অভিন্ন প্রাণসত্তা। ঈমান ও ইয়াকীন এবং আল্লাহর হুকুমের তাবেদারিই হচ্ছে সকল কর্মের পথপ্রদর্শক। ইখলাস, সহীহ নিয়ত, আল্লাহ তাআলার রেযামন্দির সত্যিকারের প্রত্যাশা ও আম্বিয়ায়ে কেরামের নির্দেশিত নিয়মে সম্পন্ন হওয়ার দ্বারা জীবনের সকল অঙ্গন এবং কর্ম ও তৎপরতার সকল ক্ষেত্রই 'ঈমানী যিন্দেগী'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। (দুস্তুরে হায়াত)

তো সূরাতুল আনআমের এই আয়াত হচ্ছে মুমিন-জীবনের কম্পাস। এরই আলোকে স্থির করুন কর্মের লক্ষ্য ও জীবনের উদ্দেশ্য। অতপর সকল কাজে এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্মরণ ও সজীব রাখুন।

কীভাবে স্মরণ করবেন? ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রয়োজন পূরণের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশাকে কীভাবে মেলাবেন?

চলুন, নিছক নীতিগত আলোচনার চেয়ে আমরা বিষয়টি দেখি আমাদের পূর্বসূরিদের বাস্তব জীবন থেকে। আমাদের কাছে তো আছে সর্বোত্তম জীবনাদর্শের জ্যোতির্ময় দৃষ্টান্তরাজি :

ঘুম ও বিশ্রামকেও 'নিয়ত'-এর দ্বারা মহিমান্বিত করার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত দুই সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল রা. ও আবু মূসা আশআরী রা.-এর একটি কথোপকথনে, যা ইমাম বুখারী

রাহ. 'কিতাবুস সহীহ'-এ বর্ণনা করেছেন।

মুআয ইবনে জাবাল রা. হযরত আবু মূসা আশআরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—

يَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কুরআন কীভাবে পড়েন?

আবু মূসা আশআরী রা. বললেন—

أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا

দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়। এরপর তিনিও প্রশ্ন করলেন—

فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟

আচ্ছা আপনি কীভাবে পড়েন হে মুআয!

মুআয রা. বললেন—

أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي.

আমি রাতের প্রথম অংশে ঘুমাই। নির্ধারিত সময়ের ঘুম পুরা হবার পর উঠে নামাযে দাঁড়াই এবং কুরআন পড়ি, যে পরিমাণ আল্লাহ আমার জন্য লিখে রেখেছেন। তো আমি আমার ঘুমেও ছওয়াবের আশা রাখি যেমন আশা রাখি আমার নামাযের কারণে। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০৮৬, ৪০৮৮

অন্য বর্ণনায় তাঁর কথাটি এভাবে আছে—

أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَتَقَوَّى بِهِ عَلَى آخِرِهِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو الْأَجْرَ فِي رَقْدَتِي كَمَا أَرْجُوهُ فِي يَقَظَتِي.

আমি রাতের প্রথম অংশে ঘুমাই এবং এর মাধ্যমে শেষ রাতে ওঠার শক্তি সঞ্চয় করি। আর আমি আমার নিদ্রার কারণেও ছওয়াবের প্রত্যাশা করি যেমন প্রত্যাশা করি জাগরণের কারণে। —আল মুসান্নাফ, ইবনে আবী শাইবা ২/৭৩, হাদীস ৬৬১৬; আল মুসনাদ, আবু আওয়ানা ৫/১০১ হাদীস ৭৯৫১; শুআবুল ঈমান বাইহাকী ২/৪০২, হাদীস ২২০০

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনীষী সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর জীবনাদর্শে পাওয়া গেল ঘুমের মতো প্রাত্যহিক বিষয়কেও উত্তম নিয়তের দ্বারা ছওয়াবের কাজে পরিণত করার নমুনা।

পৃথিবীতে আমরা যা কিছু ব্যবহার করি ও উপভোগ করি তার সবই আল্লাহর নিআমত। খাদ্য-পানীয়, আলো-বাতাস ও জীবন যাপনের সকল উপকরণ তাঁরই সৃষ্টি। আমাদের কর্ম-শক্তি ও চিন্তা-শক্তিও তাঁরই দান। কাজেই এইসকল নিআমতের ব্যবহারে আল্লাহর স্মরণ ও শোকরগোযারি আবশ্যক। আর জীবন জুড়ে সকল কর্মে রয়েছে আল্লাহর বিধান ও তাঁর পছন্দনীয় পন্থা। সেই বিধান ও পন্থার অনুসরণের দ্বারা আমাদের গোটা কর্মজীবনই হয়ে উঠতে পারে মহিমাপূর্ণ।

যদ্দুর সম্ভব শুরু করুন

খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো; ঘুম থেকে ওঠা, হাম্মামে যাওয়া, বের হওয়া; ঘরে ঢোকা, ঘর থেকে বের হওয়া ইত্যাদি ছোট ছোট প্রাত্যহিক কাজে রয়েছে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ। তা জেনে আমল করা কঠিন নয়। তবে গুরুত্ব ও আগ্রহ থাকতে হবে।

এছাড়া জীবনজুড়ে অসংখ্য বিষয় আছে, যেখানে শুধু নিয়তের প্রয়োজন। যেমন পরিবার-পরিজনকে সময় দেওয়া, সাক্ষাৎপ্রার্থীর কথা শোনা, মেহমানের সমাদর করা, যা আমরা সাধারণত করে থাকি। এইসব ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির, তাঁর বান্দাদের আনন্দদান ও তাদের হক আদায়ের নিয়তের দ্বারাই এ সকল কাজ নেক আমলে পরিণত হয়।

এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, জীবনের এক বিরাট অংশই এমন, যেখানে সঠিক নিয়ত ও সুন্নতের ইত্তিবা এখন থেকেই শুরু করা সম্ভব। এই সকল ক্ষেত্রে এই চর্চা এখনই শুরু করুন। আর যে বিষয়গুলো শরীয়ত ও সুন্নাহর অধীনে নিয়ে আসা অপেক্ষাকৃত কঠিন, যেমন কারো কারো ক্ষেত্রে আয়-উপার্জন, পর্দা-পুশিদা ইত্যাদি; ঐসব ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে, আল্লাহর বিধানে যা হারাম তাকে হারাম জানুন এবং অবশ্যই তা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করুন। সদিচ্ছা ও সঠিক চেষ্টা থাকলে উপায়ও অবশ্যই বের হয়ে আসবে। আর তখন সঠিক নিয়তের দ্বারা আয়-উপার্জনের সকল প্রয়াসই আমলে সালেহে পরিণত হবে।

বিখ্যাত মনীষী সাহাবী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন—

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ.

তুমি আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্য যে খরচই করবে এর বিনিময় (আল্লাহর তরফ থেকে) পাবে। এমনকি যা কিছু স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও। —সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস ৫৬; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল অসিয়্যাহ, হাদীস ১৬২৮

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী রাহ. হাদীসটি 'কিতাবুল ঈমান' বা 'ঈমান-অধ্যায়ে' এনেছেন। কারণ, সব কাজে আল্লাহর রেযামন্দির নিয়ত রাখা ঈমানের এক উঁচু বৈশিষ্ট্য।

বিখ্যাত তাবেয়ী যুবাইদ ইবনুল হারিছ আলইয়ামী রাহ. বলেন—

يَسُرُّنِي أَنْ يَكُونَ لِي فِي كُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ حَتَّى فِي الْأَكْلِ وَالنَّوْمِ.

অর্থাৎ আমার কাঙ্ক্ষিত বিষয় এই যে, সব কিছুতেই আমার 'নিয়ত' থাকুক; এমনকি আহার-নিদ্রাতেও। —শুআবুল ঈমান ৫/৩৫০; সিফাতুস সফওয়াহ ৩/৯৯

বলাবাহুল্য, এ যার জীবনাদর্শ তার সকল দৌড়ঝাঁপ হবে নেক আমল, হয়ে উঠবে সফল ও অর্থপূর্ণ।

ইবাদত-বন্দেগীকে সপ্রাণ করুন

ঈমানের পর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ইবাদত-বন্দেগী। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যিকির-তিলাওয়াত, আদইয়ায়ে মাসনূনা, রমযানের ফরয রোযা, অন্যান্য সময়ের নফল রোযা, যাকাত-সদাকা, হজ্ব-কুরবানী, ইতিকাফ ইত্যাদি ইবাদত আমরা সাধারণত আদায় করি। এটি আমাদের কর্মের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। এই ইবাদত-বন্দেগীকে যদি সপ্রাণ করা যায় তাহলে জীবনের এই উল্লেখযোগ্য অংশটি হয়ে উঠবে অর্থপূর্ণ, মহিমাপূর্ণ। উপায় হিসেবে এখানেও আসছে ঐ শিরোনাম— 'লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্মরণ রাখা'।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'দুস্তূরে হায়াত'-এ লেখেন—

"আমরা অনেকেই সহীহ হাদীসে বর্ণিত অযুর দুআ, মসজিদে ঢোকা ও বের হওয়ার দুআ, হাম্মামে যাওয়া, হাম্মাম থেকে বের হওয়ার দুআ, ঘুমানো ও ঘুম থেকে ওঠার দুআ, সকাল-সন্ধ্যার যিকির, সফরে যাওয়ার ও সফর থেকে ফেরার দুআ নিয়মিত পড়ে থাকি; কিন্তু আশঙ্কা জাগে, এই আমলটিও হয়তো উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার সাথে, আধুনিক উপমা দিয়ে বললে, অনেকটা টেপ রেকর্ডারের মতো উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমলের যে সওয়াব ও ফযীলত বয়ান করেছেন, আল্লাহর কাছে এর যে গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং আখেরাতে এর যে সুফল ও উপকারিতা তার স্মরণ ও আগ্রহ ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। অথচ শরীয়তে আছে ইবাদতের সাথে ইবাদতের সওয়াব ও ফযীলতের স্মরণ ও বিশ্বাসের কথাও। ইসলামের কিছু সর্বজনবিদিত ফরয-ওয়াজিব ইবাদতের ক্ষেত্রে

Scanned by CamScanner

বিশেষভাবে এই শর্তের উল্লেখ হাদীস শরীফে আছে।

'সহীহ হাদীসে এই বাণী বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিসমূহের উপর বিশ্বাস রেখে, সওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে রমযানের রোযা রাখে তার পেছনের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬০

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে (আল্লাহর প্রতিশ্রুতিসমূহের উপর) বিশ্বাস রেখে এবং ছওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে শবে কদরে ইবাদত করবে তার পেছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০১

তো এখানে 'ঈমান' ও 'ইহতিসাব' অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও ছওয়াবের প্রত্যাশা– এই দুটো বিষয় স্পষ্টভাবে আছে। কিন্তু আমাদের অনেকেই এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে খুব একটা খেয়াল করেন না। অথচ এর মাধ্যমেই কোনো কাজ অভ্যাসবশত করা আর ইবাদত হিসেবে করার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। এই বেখেয়ালির কারণে অনেক ইবাদত, এমনকি ইসলামের চার রোকন– সালাত, যাকাত, সওম ও হজ্ব পর্যন্ত পর্যবসিত হয় একটি গতানুগতিক ও প্রাণহীন কর্মে।

'আম মুসলমানের সাথে সাহাবায়ে কেরাম ও নেককার মুমিনদের পার্থক্যের এক বড় দিক এই স্মরণ ও বিস্মৃতি। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত এই ফযীলতসমূহের প্রতি তাঁদের থাকে পূর্ণ বিশ্বাস আর হৃদয়ের গভীরে থাকে তা অর্জনের গভীর প্রত্যাশা। ফলে তাদের আমল-ইবাদত সম্পন্ন হয় এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা থেকে এবং এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাসের সাথে। পক্ষান্তরে সাধারণজনের অবস্থা হয় এর চেয়ে ভিন্ন।

'যেমন ধরুন, অযু, যা দৈনিক বারবার করা হয়, আমাদের অনেকেরই জীবনে যা একটি গৎবাঁধা যান্ত্রিক কর্মমাত্র; কিন্তু সাহাবা ও সালাফের জীবনে তা এমন ছিল না। তাঁরা যখন অজু করতেন তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী তাঁদের হৃদয়ে জাগ্রত থাকত–

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

যখন কোনো মুসলিম কিংবা (বলেছেন) কোনো মুমিন অজু করে– যখন সে আপন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন মুখমণ্ডল থেকে ঐ সমস্ত গুনাহ ঝরে যায়, যা সে চোখের দ্বারা করেছে। যখন সে হাত ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা (বলেছেন,) পানির শেষ ফোঁটার সাথে ঐ সকল গুনাহ ঝরে যায়, যা সে হাত দ্বারা করেছে। এমনকি সে গুনাহসমূহ থেকে পাক সাফ হয়ে যায়। যখন সে পা ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা (বলেছেন) পানির শেষ ফোঁটার সাথে ঐ সকল গুনাহ ঝরে যায়, যার দিকে সে হেঁটে গেছে। এভাবে সে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৪

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদের উপর তাঁদের এমনই ইয়াকীন ও প্রত্যয় ছিল, যেন সবকিছু সচক্ষে দেখছেন– সেই প্রতিশ্রুত সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঐ কাজ তাঁরা করতেন। একই অবস্থা ছিল যখন তারা কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে সাক্ষাৎ করতেন এবং আনন্দ ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করতেন। একই অবস্থা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে, আয়-উপার্জনে ও পেশাগত কাজকর্মে। এককথায় যা-ই তারা করতেন ঐ আজর ও ছাওয়াব ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় করতেন। ফলে তাঁদের ইবাদত যেমন প্রকৃত ইবাদত হত তেমনি প্রাত্যহিক কাজগুলোও হতো ত'আত ও আল্লাহর ফরমাবরদারি।..." (দুস্তূরে হায়াত ২২৩-২২৪)

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. যা বলেছেন তা সূরা আনআমের ঐ শিক্ষারই কিছু ব্যাখ্যা ও প্রায়োগিক নমুনার বিবরণ, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي...

বল, আমার নামায, আমার ইবাদত...।

জীবনের সকল কর্মের সূচনায় এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে স্মরণ করুন এবং এরই দাবি অনুসারে ঐ কাজটি সম্পন্ন করুন। আপনার কাজটি হয়ে উঠবে অর্থপূর্ণ ও মহিমাপূর্ণ।

জীবনের নানা অবস্থা কীভাবে মহিমান্বিত হয়

উর্দূতে একটি পংক্তি আছে–

زمانہ ایک حال رہتا نہیں + گذشتہ زمانہ پھر آتا نہیں

সময় কখনো এক অবস্থায় থাকে না। আর যে সময় যায় তা আর ফিরে আসে না।

মানুষের জীবন নিত্য পরিবর্তনশীল। সুখ-দুখ, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সুস্থতা-অসুস্থতা, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি নানা অবস্থা নিয়েই জীবন। এই নানা রূপ-অবস্থার মধ্য দিয়েই জীবন এগিয়ে চলে এবং সময় ফুরোতে থাকে। জীবনের অনভিপ্রেত অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থাগুলোকে জীবন থেকে বিয়োগ করা যায় না। এগুলো জীবনেরই অংশ। এই অবস্থাগুলোও কি মহিমান্বিত ও কল্যাণপূর্ণ হতে পারে? এমন কোনো উপায় কি আছে, যার দ্বারা জীবনের এই অংশটিও ইতিবাচক হতে পারে? সঞ্চয়ের খাতায় কিছু যোগ করতে পারে?

জী, সে উপায় আছে এবং তা মুমিনের জন্য। মুমিনের শুধু কর্ম নয়, তার জীবনের সকল অবস্থাই হতে পারে মহিমাপূর্ণ ও কল্যাণপূর্ণ। 'অবস্থা' বলতে বোঝাচ্ছি জীবনের ঐসকল অনুষঙ্গ যা সরাসরি কর্ম নয়, তবে এর সাথেও রয়েছে বিশ্বাস ও কর্মের সংযোগ। যেমন সুখ-দুখ, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি। এই সকল অবস্থাও কল্যাণপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং যথার্থ বিশ্বাস ও কর্মের দ্বারা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ–

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

মুমিনের কী শান! তার সব কিছুই তার জন্য কল্যাণকর; যদি সে সুখ ও সচ্ছলতা লাভ করে তাহলে শোকরগোযারি করে। ফলে এই সুখ তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি অসুখ-অসচ্ছলতার শিকার হয় তাহলে সবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৯৯

সবর ও শোকরের যে শিক্ষা ইসলাম দান করেছে তার এক গভীর তাৎপর্য ও সুফল এই হাদীস থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ইসলামের সকল শিক্ষাই তাৎপর্যমণ্ডিত, যদি আমরা আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

এইটুকু আলোচনা থেকেও বুঝে নেওয়া সম্ভব যে, আমাদের কারোর জীবনই অর্থহীন নয়। যে মানুষকে আল্লাহ সর্বোত্তম দৈহিক ও মানসিক গঠনে তৈরি করেছেন তার জীবন অর্থহীন হতে পারে না, যদি সে তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করে এবং তার আদেশ মান্য করে। ●

Scanned by CamScanner

জ্যোতির্বিজ্ঞানে মধ্যযুগের মুসলমানদের অবদান

ড. গোলাম কাদির লূন

প্রবন্ধটির প্রথম কিস্তি যিলহজ্ব ১৪৩৮ হিজরী/সেপ্টেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ২য় কিস্তি ছাপা হয়েছে গত সংখ্যায়-রবিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরী/ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী। এ সংখ্যায় এর সর্বশেষ কিস্তি ছাপা হল। এ বিষয়টি সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একাধিক শাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যদি কোনো শাস্ত্রজ্ঞের নজরে মূলে বা অনুবাদে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে মেহেরবানী করে আমাদের অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল। –সম্পাদক

[মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে খোজ-খবর রাখেন এমন ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মুসলমান পণ্ডিতগণ অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। অনেক কিছুর তো আবিষ্কারও তাঁরা করেছেন। এসব কাজে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় অকাতরে অর্থ বিলিয়েছেন তাঁরা। এসব গবেষণাকর্ম পরবর্তী যুগে বিজ্ঞানের উন্নতিতে ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়েছে। খোদ পশ্চিমের অমুসলিম বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণও এ বাস্তবতা বর্ণনা করেছেন এবং এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন। যদিও একতরফা পড়াশোনা ও হীনম্মন্যতার কারণে অনেক মুসলমান আজ নিজেদের এই ঐতিহ্যের খবর রাখেন না বা স্বীকার করেন না। বিশিষ্ট গবেষক ড. গোলাম কাদির লূন-এর এ সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য নিবন্ধের (কিছু পরিমার্জনের পর) অনুবাদ করেছেন আমাদের স্নেহভাজন মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আবদুল জলীল। তরজমাটি বেশ প্রাঞ্জল হয়েছে। আশা করি পাঠক এতে চিন্তার ও আনন্দের খোরাক পাবেন। –তত্ত্বাবধায়ক]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫. জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের আরেকটি অবদান হল, তারা সৌর বছরের এমন একটি ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেন, যা বর্তমানে প্রচলিত গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের চেয়েও ভালো। মুসলমানরা সৌর বছরের সঠিক দৈর্ঘ্য জানার প্রথম চেষ্টা করেন খলীফা মামুনুর রশীদের আমলে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আলবাত্তানী বছরের দৈর্ঘ্য আবিষ্কার করেন, তা গ্রিকদের বর্ণিত সময়ের বিপরীতে আজকের গ্রহণযোগ্য সময়ের অধিক নিকটবর্তি। জালালুদ্দীন মলিক শাহ-এর যুগে মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতশাস্ত্রবিদ উমর খৈয়াম 'তারীখে জালালী' নামে একটি ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করেন। তিনি গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর সৌর বছরের দৈর্ঘ্যকাল আবিষ্কার করেন, যা আধুনিক বর্ণনারীতি অনুযায়ী ৩৬৫.২৪২৪ দিন। প্রচলিত গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার, যাকে আমরা খ্রিস্টীয় বছর বলে থাকি– এর দৈর্ঘ্য হল, ৩৬৫.২৪২৫ দিন আর প্রকৃত সৌর বছর হল ৩৬৫.২৪২২ দিন। এখনকার প্রচলিত ক্যালেন্ডারে মূল ক্যালেন্ডার বা সৌর বছর থেকে ০.০০০৩ দিন বাড়তি। যা শুধু ৩৩৩০ বছরে একত্রিত হয়ে একদিন হবে। তখন তারিখে একদিনের ব্যবধান হবে। এর বিপরীতে উমর খৈয়াম যে ক্যালেন্ডার তৈরি করেন তা আজকের ক্যালেন্ডারের চেয়ে এদিক দিয়ে উত্তম–এর মধ্যে মূল সৌর বছর থেকে শুধু ০.০০০২ দিন বাড়তি, যা পাঁচ হাজার বছরে একদিন বাড়তি হবে। প্রচলিত গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে একদিনের ব্যবধান হবে মাত্র ৩৩৩০ বছরে। আর উমর খৈয়ামের ক্যালেন্ডারে তারিখে একদিন পরিবর্তন করতে হবে ৫০০০ বছর পর।

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ : ۲۷۱: ۱/ ۱٤)

আধুনিক ক্যালেন্ডার বিশেষজ্ঞ CALVIUS-এর বক্তব্য হল, কোপারনিকাস প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি বছরের একেবারে সঠিক পরিমাণ আবিষ্কার করেন। কিন্তু তার এ বক্তব্য সঠিক নয়। কোপারনিকাস রোমের প্রধান পাদরির ইঙ্গিতে ক্যালেন্ডারে কয়েকটি সংশোধন আনেন এবং বছরের সঠিক দৈর্ঘ্য জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সে সফলতা লাভ হয়নি, যা লাভ হয়েছিল চারশ বছর পূর্বে উমর খৈয়ামের। পরবর্তী বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট করে দেন বছরের দৈর্ঘ্যে কোপারনিকাসের আটাশ সেকেন্ড ভুল হয়। উমর খৈয়ামের আবিষ্কৃত দৈর্ঘ্য বছরের প্রকৃত দৈর্ঘ্য থেকে শুধু ১১.৩ সেকেন্ড বেশি। উমর খৈয়ামের এ অসাধারণ প্রজ্ঞার স্বীকারোক্তি খ্রিস্টান ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদরাও করেছেন। ফিলিপ কে. হিট্টি উমর খৈয়ামের ক্যালেন্ডারের ব্যাপারে লিখেন–

This calendar, in the Judgment of a modern scholar, is "somewhat more accurate than ours". (History of the Arabs P. 477)

আধুনিক কালের এক বিশেষজ্ঞের মতে এ ক্যালেন্ডার আমাদের ক্যালেন্ডারের চেয়েও বেশি সঠিক।

উমর খৈয়াম একজন কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ। তার চৌপদী দুনিয়াজোড়া খ্যাত। কিন্তু অনেক কম মানুষই জানে, তিনি উঁচু মাপের গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি মানমন্দিরগুলোতে বছরের পর বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দিকনির্দেশনা দেন, যার ফলে التاريخ الجلالي-এর মতো ক্যালেন্ডার প্রস্তুত হয়। ফিলিপ কে. হিট্টি লেখেন–

Umar is known to the world primarily as a persian poet and free-thinker; very few realize that he was a frist- class mathematician and astronomer as well. The researches of Al-khayyam and his collaborators resulted in the production of the calendar named after his patron al-Tarikh al-Jalali, which is even more accurate than the Gregorian calendar. The latter leads to an error of one day in 3330 years, where- as al-khayyam's apparently leads to an error of one day in about 5000 years. (History of the Arabs P. 377)

পৃথিবী উমর খৈয়ামকে একজন ফারসী কবি ও মুক্তমনা হিসেবে জানে। অনেক কম মানুষই জানে, তিনি উঁচু মাপের গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি এবং তার সহকর্মী বিজ্ঞানীদের গবেষণায় একটি ক্যালেন্ডার প্রস্তুত হয়, যাকে পৃষ্ঠপোষকের নামে التاريخ الجلالي বলা হয়। যা আজকের প্রচলিত গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের চেয়েও বেশি সঠিক। এতে ৩৩৩০ বছরে একদিনের ব্যবধান হয় আর খৈয়ামের ক্যালেন্ডারের ৫০০০ বছরে একদিনের ব্যবধান হবে।

৬. জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের আরেকটি সোনালী অবদান হল, তারা ইউরোপীয়দের দৃষ্টি মাটির বিছানা থেকে তারাভরা আকাশে নিয়ে যান। তাদের রচিত আরবী কিতাবগুলোর গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু, স্পেনিশ, পর্তুগিজ, ক্যাস্টিলিয়,

ফ্রেঞ্চ, জার্মানি ও ইংরেজি অনুবাদগুলোর মাধ্যমে পশ্চিমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। স্পেনে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা সমাপন করে ইহুদী-খ্রিস্টান পণ্ডিতরা আরবীর জ্ঞানভাণ্ডার ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য স্মারক স্থাপন করে। তাদের পঞ্জিকার সহায়তায় ১১৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্সেইল-এর অধিবাসী রেমন্ড নিজ রচনা এবং আলফোনসো দশম তেরো খ্রিস্টিয় শতাব্দীতে নিজ তত্ত্বাবধানে পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন। ফিলিপ কে. হিট্টি পশ্চিমের ওপর মুসলমানদের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন–

Finally it was through spanish channels that the Latin west found its Oriental inspiration in astronomy and astrology. The leading Muslim astronomical works were translated in Spain into Latin, and the Alfonsine tables compiled under the aegis of Alfonso X in the thirteenth century were but a development of Arab astronomy. (History of the Arabs P.570)

শেষ পর্যন্ত প্রাচ্যের জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা স্পেনের মাধ্যমেই ল্যাটিনভাষী পশ্চিম দুনিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। স্পেনে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয়। তেরো শতাব্দীতে আলফোনসো দশমের তত্ত্বাবধানে যে আলফোনসাইন সারণী রচিত হয় তা আরবী জ্যোতির্বিজ্ঞানেরই পরিমার্জিত রূপ।

তিনি আরো বলেন, মার্সেইল-এর অধিবাসী রেমন্ডের রচনাও অধিকাংশ আযযারকালীর পঞ্জিকা থেকে গৃহিত।

আরবদের জ্যোতির্বিজ্ঞান তখন ইউরোপের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করতে শুরু করে। খ্রিস্টান শিক্ষক গার্বার্ট (Gerbert) পরবর্তীতে Pope sylvester II নামে প্রসিদ্ধ হন, স্পেনে পড়াশোনার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়গুলো সঙ্গে করে নিয়ে যান। Rheims-এ অবস্থিত নিজ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। এগারো শতাব্দীতে আফ্রিকার পাদরী কন্সটান্টিন (মৃত্যু : ১০৮৭) স্পেনে পড়াশোনা শেষ করে রোমে যান। মাউন্ট ক্যাসিনোর উপাসনালয়ে বেনিডিক্ট পাদরিদের সঙ্গে থেকে আরবী গ্রন্থগুলোর অনুবাদ শুরু করেন। তারপর বাথ-এর পাদরি অ্যাডেলার্ড কর্ডোভা থেকে নিজের সঙ্গে করে আরবী কিতাবের বড় একটি অংশ নিয়ে যান এবং নিজ ভাতিজার সহায়তায় অনুবাদ করে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে ছড়িয়ে দেন। বারো শতকে তরজমার কাজ বেশ গতি লাভ করে। এ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ অনুবাদকদের মধ্যে বাথ-এর অ্যাডেলার্ড ছাড়াও ক্রেমোনার অধিবাসী জেরার্ড ও জন ইশবিলী প্রসিদ্ধ। আরবী গ্রন্থের অনুবাদের কাজ পরের শতাব্দীতেও অব্যাহত থাকে। আধুনিক কালে অনুবাদের কাজ ইউরোপের অন্যান্য ভাষা– স্পেনিশ, জার্মানি, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি ও রুশ ভাষায় হয়। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের তরজমা ও গবেষণার ধারা ইউরোপ ও আমেরিকায় আজও আগ্রহের সঙ্গে হচ্ছে। মধ্যযুগে আরবী থেকে যে তরজমা ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় হয়েছিল তার কিছু প্রসিদ্ধ তরজমার বিবরণ নিম্নরূপ :

১. বারো শতাব্দীর শুরুতে বাথ-এর অ্যাডেলার্ড খুওয়ারিযমী পঞ্জিকা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

২. বারো শতকের শেষার্ধে ক্রেমোনার জেরার্ড جداول الطليطلي-এর ল্যাটিন তরজমা করেন। এ সংকলনে খুওয়ারিযমী, আলবাত্তানী ও আযযারকালীর পঞ্জিকাগুলোও ছিল।

৩. ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন ইশবিলী আলফারগানী রচিত جوامع علم النجوم الحركات السماوية-এর ল্যাটিন অনুবাদ করেন, যা ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফেরেরা থেকে, ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে নুরেমবার্গ থেকে, ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। বারো শতাব্দীর শেষার্ধে ক্রেমোনার অধিবাসী জেরার্ডও এর ল্যাটিন অনুবাদ করেন, যা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বেশ সুসজ্জিত আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়। ইয়াকুব আনাতুলী (jacob Anatoli) এ গ্রন্থের হিব্রু অনুবাদ করেছিলেন। এ হিব্রু অনুবাদটিকে ইয়াকুব ক্রিস্টম্যান (Jacob christmann) ল্যাটিন পোশাক পরায়, যা ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ইয়াকুব জুলিয়াস গ্রন্থের মূল আরবী পাঠ ল্যাটিন তরজমা ও ব্যাখ্যাসহ ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে এ্যামস্টারডাম Amsterdam থেকে প্রকাশ করেন।

৪. আবূ মা'শার বলখী রচিত المدخل الكبير على علم أحكام النجوم -এর অনুবাদ ১১৩৩ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় করা হয়। এ অনুবাদ খুব সম্ভব জন ইশবিলী করেছিলেন। ১১৪০ খ্রিস্টাব্দে সামান্য সংক্ষেপিত হয়ে জনসম্মুখে আসে। ১৪৮৯/১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে (Augsburg) আউগ্‌সবুর্গ থেকে, ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে ভেনিস থেকে প্রকাশিত হয়। ল্যাটিন অনুবাদকে তেরো শতাব্দীর শেষের দিকে হিব্রু পোশাক পরানো হয়। আবূ মা'শারের আরেক গ্রন্থ المدخل الصغير অ্যাডেলার্ড বারো শতকে ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তর করে। তার রচিত كتاب القرانات জন ইশবিলী ল্যাটিন অনুবাদ করেন। ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে Augsburg আউগ্‌সবুর্গ থেকে, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে ভেনিস থেকে প্রকাশিত হয়। এ অনুবাদক আবূ মা'শারের আরেকটি কিতাব كتاب تحاويل سني العالم ল্যাটিন ভাষায় রূপান্তরিত করেন, যার তিনটি এডিশন ১৪৮৮, ১৪৮৯ ও ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে) Augsburg (আউগ্‌সবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়। দুইটি মুদ্রণ ১৪৮৮ ও ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে ভেনিস থেকে প্রকাশিত হয়। তার রচিত كتاب الصور والحكم عليها -এর অনুবাদ গ্রিক ভাষায় হয়। গ্রিক থেকে ল্যাটিন ভাষায় হয়। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে এইচ উলফ বাজেল (Basel) থেকে প্রকাশ করেন। আবূ মা'শারের অন্য আরও গ্রন্থের পূর্ণ অথবা আংশিক অনুবাদ হয়েছে।

৫. আলবাত্তানীর زيج الصابي -এর ল্যাটিন তরজমা এক ইংরেজ বারো শতকে করেছিল। পাণ্ডুলিপিটি দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় ল্যাটিন তরজমা আফলাতুন তিফুলী Plato Tiburtinus বারো শতকের শুরুর দিকে করেন। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে নুরেমবার্গ থেকে, ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে Bologna থেকে প্রকাশিত হয়। এর স্পেনিশ তরজমা আলফোনসো দশমের নির্দেশে তেরো শতকে করা হয়। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এক ইতালীয় প্রাচ্যবিদ زيج الصابي -এর দৃষ্টিনন্দন আরবী সংস্করণ প্রকাশ করেন। এরপর এটি ল্যাটিন তরজমা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হয়।

৬. হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে আব্দুল আযীয ইবনে উসমান আলকাবীসী المدخل إلى علم النجوم রচনা করেছিলেন। ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে জন ইশবিলী ল্যাটিন ভাষায় এর অনুবাদ করেন। ১৩৩১ সালে প্যারিস থেকে এর ওপর পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে আরেকটি পর্যালোচনা জনসম্মুখে আসে। ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দে আলকাবীসীর এই কিতাবের ফ্রেঞ্চ তরজমা হয়। ল্যাটিন তরজমা ঈসাগুজি (Isagogi) নামে পনেরো অথবা ষোলো শতকে কমপক্ষে দশবার প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন জন এ গ্রন্থটি একাধিকবার ব্যাখ্যা ও টীকাসহ ১৪৮২, ১৪৮৫, ১৫১২ (দুই বার) ১৫২১ (দুই বার) ভেনিস থেকে প্রকাশ করে। ১৫১২ ও ১৫২১ সালে প্রকাশিত দুইটি মুদ্রণ পৃথক পৃথক প্রকাশক প্রকাশ করেন। ১৫৭৩ সালে এই তরজমা বুনিয়া এবং ১৫২০ সালে লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৫২১ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৫৬০ সালে এর ব্যাখ্যা কোলোন koln থেকে ছাপা হয়। ১৯০৫ সালে আরেকটি

Scanned by CamScanner

ভাষ্য ফ্লোরেন্স থেকে প্রকাশিত হয়। ১৪৭৩ থেকে নিয়ে ১৫২১ পর্যন্ত ইউরোপে ওই গ্রন্থের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৭. জাবের ইবনে আফলাহের কিতাব إصلاح المجسطي -এর ল্যাটিন তরজমা বারো শতকে ক্রেমোনার জেরার্ড করেন। এরপর মূসা ইবনে তাব্বুন ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপর ইয়াকুব ইবনে মাজের মূসার ভাতিজা এর আরেকটি হিব্রু অনুবাদ করেন। স্যামুয়েল ইবনে ইয়াহুদ ১৩৩৫ সালে এর পুনঃসম্পাদনা করেন। জেরার্ডের ল্যাটিন অনুবাদ ১৫৩৪ সালে নুরেমবার্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

৮. ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে বাথ-এর অ্যাডেলার্ড মাসলামা আলমাজরিতীর পঞ্জিকার ল্যাটিন অনুবাদ করেন।

৯. আলবাতরুজী রচিত كتاب الهيئة -এর অনুবাদ মাইকেল স্কট তেরো শতকে করেন। এফজে কারমোডি ১৯৫২ সালে Berkeley থেকে প্রকাশ করেন। ক্লানিমুস Calonymos ইবনে দাউদ كتاب الهيئة -এর আরেকটি তরজমা ল্যাটিন ভাষায় করেন, যা ভেনিস থেকে ১৫৩১ সালে প্রকাশিত হয়। মূসা ইবনে তাব্বুন একে হিব্রু ভাষায় রুপান্তর করেন। বার্নার্ড আর গোল্ডস্টেইন এ তরজমাটির আরবী মূল পাঠ ও ইংরেজিসহ ১৯৭১ সালে দুই খণ্ডে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন।

১০. ১৯৬৭ সালে ইহুদী পণ্ডিত ইবরাহীম ইবনে অযরা 'মাশাআল্লাহ'র পঞ্জিকা ক্যাস্টলিও ভাষায় এবং তার বন্ধু ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

১১. আযযারকালীর পঞ্জিকা الزيج الطليطلي -এর দুটি অনুবাদ হয় ল্যাটিন ভাষায়। একটি তরজমা করেন জেরার্ড, আরেকটি করেন জন ইশবিলী। তার ক্যালেন্ডারের তরজমা ল্যাটিন, হিব্রু, পর্তুগিজ, ক্যাস্টলীয় ভাষায় হয়।

১২. ১১৬০ সালে ইবরাহীম ইবনে আযরা খুওয়ারিযমী পঞ্জিকা অবলম্বনে আলবেরুনী কৃত ভাষ্যগ্রন্থের তরজমা করেন।

১৩. ১১৪৩ সালে টলেমি বিষয়ক মাজরিতীর রচনার তরজমা করেন Hermann The Dalmation।

১৪. ১২৩৬ সালে মাইকেল স্কট বাতরুজীর গ্রন্থের তরজমা করেন।

১৫. নাসীরুদ্দীন তূসী রচিত زيج ايلخانى -এর তরজমা (অংশিক) হয়েছে ল্যাটিন ভাষায়, যা ১৬৫০ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। (History of the Arabs P. 588-589)

আরবী ভাষায় রচিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ অনুবাদের এ হল সামান্য ঝলক। এখানে শুধু সেসব কিতাব অনুবাদের আলোচনা করা হয়েছে যেগুলোর নাম সাধারণত ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়। বাস্তবে তা জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর রচিত গ্রন্থরাজির শতভাগের এক ভাগও নয়। অনেক অনুবাদ ল্যাটিন ভাষা ছাড়া অন্যান্য পশ্চিমা ভাষায় হয়েছে, যেগুলো এখনো গবেষণার বাইরে অথবা যেগুলোর লেখক ও অনুবাদকদের নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। শুধু ল্যাটিন তরজমাগুলোর ওপর গবেষণা করে এফ জে কারমোডি একটি গ্রন্থ রচনা করেন।[1] অধিকন্তু কোনো কোনো গবেষক বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান বিষয়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন। যেগুলোর মাধ্যমে অনেক গ্রন্থ ও পঞ্জিকার পরিচয় পর্যালোচনা, আলোচনা ও আলোকপাত জনসম্মুখে আসে। এ পর্যন্ত এমন অনেক প্রবন্ধ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

ইউরোপের কিছু সাম্প্রদায়িকমনা বিশেষজ্ঞ মুসলমানদের অবদান এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাদের ব্যক্তব্য হল, মুসলমানদের মাঝে কোনো কোপারনিকাস ও নিউটন জন্ম হয়নি। কিন্তু তারা রবার্ট ব্রেফাল্টের এ কথা ভুলে যায়, মুসলমানরা যে অবদান রেখেছে তা ছাড়া কোপারনিকাস ও নিউটনের জন্মই হতো না। এরপর এটাও এক তিক্ত বাস্তবতা– কোপারনিকাস বা ক্যাপলার, গ্যালিলিও কিংবা ট্যুকোব্রাহে সবাই মুসলমানদের গবেষণাজাত আবিষ্কার ও সৃষ্টিগুলোকে অবলীলায় নিজের নামে চালিয়ে দেন। যেমন রাতের চুরি করা সম্পদ দিনের বেলা নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। কোপারনিকাসের কথাই ধরুন, তিনি Bologna ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতার সময় আরব গণিতশাস্ত্রবিদদের গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন। তার গ্রিক ভাষা শেখার একটি কারণ এও ছিল, যেন মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের রচনার গ্রিক অনুবাদগুলো পড়তে পারেন, তার সব খ্যাতির কারণ হল, তিনি তার রচনা উব revolutionibus orbium coelestium গ্রন্থে 'গ্রহ নক্ষত্রের ঘূর্ণন পৃথিবী কেন্দ্র করে' এ দর্শন প্রত্যাখ্যান করেন। টলেমির এ দর্শনের বিপরীত মত পোষণ করেন কোপারনিকাস। তিনি বলেন, সমস্ত গ্রহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে না; বরং সমস্তগ্রহ সূর্যের পাশে বৃত্তাকারে ঘুরে। সব গ্রহের একই অবস্থা। কোপারনিকাসের এ দর্শনে সূর্য কেন্দ্র হওয়ার ধারণা দেওয়া হয়। কিন্তু এ দর্শন তার নিজস্ব ছিল না। তার আগে গ্রিক গণীতবিদ পিথাগোরাস ও Aristarchus -এরও মতামত ছিল যে, সব সৃষ্টির কেন্দ্র পৃথিবী নয়, সূর্য। কিন্তু এ্যারিস্টটল এ বলে তাদের বিরোধিতা করেন, পৃথিবী যেহেতু সৃষ্টির সেরা জীবের বাসস্থান তাই সমস্ত সৃষ্টিজগতের কেন্দ্রও পৃথিবী হওয়া চাই। এ্যারিস্টটলের বিরোধিতার কারণে পিথাগোরাস ও Aristarchus-এর মত গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। গ্রিক ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থাবলির মাধ্যমে মুসলমানরা উভয় মত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন, যা তৈরি করার সময় পৃথিবী ঘূর্ণায়মান হওয়ার দর্শনগুলো সামনে ছিল। এ ছাড়াও মুসলমানরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির নিয়ম-কানুনগুলোর ত্রুটি চিহ্নিত করে কোপারনিকাসের জন্য পথ সহজ করে দেয়। টলেমির ওপর যারা আপত্তি তুলেছেন তাদের মধ্যে আলবাত্তানী, জাবের ইবনে আফলাহ ও আলবাতরুজী প্রসিদ্ধ। কোপারনিকাসের অধ্যয়নে গ্রিক ও মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পাণ্ডুলিপি থাকত। টলেমির ওপর মুসলমানদের কৃত আপত্তিগুলো তার জানা ছিল। তিনি নিজ গ্রন্থে আলবাত্তানীর অনেক উদ্ধৃতি এনেছেন। জাবের ইবনে আফলাহের Spherical Trigonometry সম্পর্কেও জানতেন।

Spherical Trigonometry সম্পর্কেও জাবেরের মতো তার সাধারণ ধারণা ছিল। তিনি এও জানতেন জাবের টলেমির ওপর আপত্তি তুলেছিলেন। তিনি আলবাতরুজীর দর্শন সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। নাসীরুদ্দীন তূসীর বেশ কিছু দর্শন এই ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ওখানে পাওয়া যায় এবং তাকে এর স্রষ্টা মনে করা হয়। গত চল্লিশ বছরের গবেষণায় এ মজার বিষয়টি আবিষ্কার হয়েছে যে, কোপারনিকাস নিজ রচনায় চাঁদ ও বুধের যে মডেল উপস্থাপন করেছেন তা মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে শাতেরের কিতাবে হুবহু ছিল। যিনি কোপারনিকাসের জন্মের শত বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ক্যাপলারের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন নয়। তিনিও কদমে কদমে মুসলমানদের থেকে সুবিধা নিয়েছেন। মুসলমানদের না জানি কত সৃষ্টি ও আবিষ্কার আছে, যেগুলোকে আজ ক্যাপলারের সম্পদ বলা হয়। ফিলিপ কে. হিট্টি ও J.M Millas -এর বর্ণনা মোতাবেক জোয়ার-ভাটায় চাঁদের যে প্রভাব তার নিয়ম-কানন সম্পর্কে ইউরোপীয়দের আবূ মা'শার বলখী অবগত করেছেন। কিন্তু এখন এটাকে ক্যাপলারের আবিষ্কার গণ্য

1. (F.J. Carmody : Arabic Astronomical and Astrological Sciences in Latin Translation : A. Critcal Bibiliography, Berkeley- Los Angels 1959)

করা হয়, যিনি আবু মা'শারের মৃত্যুর ৬৮৫ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। (History of the Arabs P. 378)

ওয়েল ডোরান ও ফিলিপ কে. হিট্টির মতানুসারে চশমা ইবনে ফিরনাস আবিষ্কার করেন। (The Age of Faith P. 298) কিন্তু এখন ইউরোপীয়রা বলছে, দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে ক্যাপলার চোখের বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। তখন তিনি চশমা আবিষ্কার করেন। অথচ ইবনে ফিরনাস ক্যাপলার জন্মের ৬৮৪ বছর আগের মানুষ ছিলেন। চক্ষু বিষয়েও ক্যাপলারের ওপর ইবনুল হায়সামের অনেক অবদান আছে। তার চিন্তা-চেতনার মধ্যে এই মহান চক্ষু বিশেষজ্ঞের গভীর প্রভাব রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বেলায়ও ক্যাপলার মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার দ্বারা উপকৃত হন। আলবাত্তানীর زيج الصابي এবং ইবনে ইউনুসের الزيج الكبير الحاكمي -এর তরজমা তার সামনে ছিল। এর চেয়ে বড় কথা হল গ্রহের উপবৃত্তাকার ঘূর্ণন যে তিন প্রসিদ্ধ নিয়মে সীমাবদ্ধ তার প্রথম নিয়মটিই আযযারকালী থেকে নেওয়া, যিনি তার জন্মের চারশ বছর আগের মানুষ।

একই অবস্থা গ্যালিলিওর, তিনি ইবনে বাজ্জাহর গতিসম্পর্কিত তত্ত্ব থেকে পুঁজি পেয়ে এ্যারিস্ট্যটলের 'পতনশীল বস্তুর গতি তার ওযন অনুপাতে হয়'- এই মতামতের রদ করেন। ইবনে বাজ্জাহ ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞানীদেরও এ মতামত ছিল। 'পতনশীল বস্তুর গতির সম্পর্ক তার পরিমাণের সঙ্গে নয়'।

গ্যালিলিও এ দর্শন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ গল্প তৈরি হয়, তিনি পিসার মিনার থেকে এক পাউন্ড ও দশ পাউন্ডের শিশার বল এক সঙ্গে ছুড়ে দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ঢালুতে পতিত হওয়ার সময় বস্তুর গতি সংক্রান্ত দর্শন সর্বপ্রথম ইবনে বাজ্জাহ উপস্থাপন করেন। ইবনে রুশদের লেখার মাধ্যমে পশ্চিম ল্যাটিনরা তার অবগতি লাভ করে। গ্যালিলিওও সে সম্পর্কে জানতেন। সময় গনার জন্য সর্বপ্রথম প্যান্ডুলামের ব্যবহার ইবনে ইউনুস করেন, যা ইউরোপীয়রাও স্বীকার করেছেন। কিন্তু ইউরোপীয়রা এটাকে গ্যালিলিওর আবিষ্কার বলে থাকে। অথচ ইবনে ইউনুসের মৃত্যুর পাঁচশ বছর পর গ্যালিলিওর জন্ম। আবু মা'শার বলখী ২৭ মুহাররম ২১৭ হিজরীতে দূরবীন আবিষ্কার করেন। কিন্তু এখন এটাকে গ্যালিলিওর আবিষ্কার মনে করা হয়। সূর্যপৃষ্ঠে দাগ সর্বপ্রথম ইবনে রুশদ চিহ্নিত করেন। ইউরোপের বইপত্রে লেখা আছে, এ দাগ প্রথম গ্যালিলিওর দূরবীনে ধরা পড়ে, যিনি ইবনে রুশদের ৩৬৬ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।

একই অবস্থা ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ট্যুকোব্রাহের। তিনি মুসলমানদের গ্রন্থাবলি থেকে প্রভূত সুবিধা নেন। তিনি আলবাত্তানীর প্রচুর উদ্ধৃতি আনেন। তার দুটি মানমন্দিরই মারাগার মুসলিম মানমন্দিরের নমুনায় বানানো হয়েছিল। ইউরোপের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখকরাও স্বীকার করেন, এ ব্যবস্থাপনা, যন্ত্র স্থাপন ও পর্যবেক্ষণ মারাগার মানমন্দিরের নকল ছিল এবং তিনি নিজেও মারাগার মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুকরণ করতেন।

জ্ঞানগত বিষয়ের ঘৃণিত চৌর্যবৃত্তি দুনিয়ার অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে ইউরোপে ব্যাপক। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানও তাদের হাত থেকে নিরাপদ থাকেনি। পশ্চিমের বড় বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ কাজ করেন। তেরো শতাব্দীতে Robert Grosseteste (মৃত্যু : ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দ) যিনি কিছুদিনের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি টলেমির দর্শন রদ করেন। নিজের বইয়ের সব বিষয়বস্তু আলবাতরুজীর গ্রন্থ থেকে চুরি করেন। তিনি টলেমির দর্শন রদ করে সারা ইউরোপে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। স্মর্তব্য, মধ্যযুগের নামকরা বিজ্ঞানীদের একজন হলেন এই রবার্ট। এরচেয়ে হতাশাজনক আচরণ করেন মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী Regiomontanus, যিনি মহাবিশ্ব বিষয়ে রচিত De Triangulis -এর চতুর্থ অধ্যায় জাবের ইবনে আফলাহ থেকে চুরি করেন। তার চুরির এ রহস্য কার্ডানো (Cardano) উন্মোচিত করেন। ইউরোপের খ্রিস্টান পাদরীদের আঁচলও এ কারণে কলঙ্কিত। এগারো শতকের খ্রিস্টান পাদরী কুস্তুনতীন আফ্রীকী Constantine The African (মৃত্যু : ১০৮৭) তাদের মধ্যে গণ্য, যারা ল্যাটিন দুনিয়ায় আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার করে ইউরোপের ওপর বড় অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু চৌর্যবৃত্তির বেলায় এ দুনিয়াত্যাগী পাদরী দুনিয়া পূজারীদেরও হার মানান। ম্যাক্স মিরহাফ লিখেন-

Constantine was a shameless plagiarist claiming for him self many works which he had translated from Arabic into Latin. (The Legacy of Islam P. 346)

কনস্ট্যানটাইন একজন নির্লজ্জ চোর। তিনি অনেক কিতাবের লেখক হওয়ার দাবি করেন, যেগুলো তিনি আরবী থেকে ল্যাটিন অনুবাদ করেছিলেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা এখন কঠিন মনে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিমা ভাষায় অনূদিত আরবী গ্রন্থাবলির কমপক্ষে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জনসম্মুখে আনা হয়। এখন পর্যন্ত যে গবেষণা হয়েছে তার মাধ্যমে জানা গেছে, ইউরোপে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ফিলিপ কে. হিট্টিও একথা স্বীকার করেছেন-

Several of the Moslem works on astronomy were translated in course of time into Latin, especially in Spain, and exercised a determining influence on the development of The science in Christian Europe. (History of the Arabs P. 378)

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে মুসলিমদের অনেক রচনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে স্পেনে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এ অনুবাদগুলো খ্রিস্টান ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নয়নে মিমাংসাপূর্ণ অবদান রাখে।

মুসলমানরা ইউরোপকে শুধু মেধার আলোয় আলোকিত করেননি বরং তাদের দেশে নিজেদের স্মৃতিও অঙ্কিত করে আসেন। ড্রেপারের বক্তব্য অনুযায়ী ইউরোপে সর্বপ্রথম মানমন্দির মুসলমানরাই স্থাপন করেন। ইশবিলিয়ার জিরাল্ডা মিনার এ উদ্দেশ্যেই ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট গণিত বিশারদ জাবের ইবনে আফলাহের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করা হয়।

(History of the Intellectual Development of Europe. Vol. II, P. 42)

অন্যত্র তিনি লেখেন-

The first medical college established in Europe was that founded by Saracens at Salerno, in Italy. The first astronomical observatory was that erected by them at Seville, in Spain. (History of the Conflict Between Religion and Science. p.115)

ইউরোপের সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজ, যা আরবরা ইটালির সালারনোতে স্থাপন করে এবং প্রথম মানমন্দির, যা আরবরা স্পেনের ইশবিলিয়াতে স্থাপন করে।

স্পেন থেকে যখন মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হল তখন খ্রিস্টানরা অজ্ঞতার দরুণ বুঝতেই পারেনি- মিনার দিয়ে কী কাজ হতো। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে ছিল অন্ধ, তাই মানমন্দিরের বিষয়টি কল্পনাও করতে পারত না। অবশেষে মিনারকে গির্জার

Scanned by CamScanner

ঘণ্টাঘর বানায়। ড্রেপারও এ দুঃখজনক ঘটনা উল্লেখ করেছেন–

After the expulsion of the Moors, it was turned into a belfry, the Spaniards not knowing what else to do with it. (History of the Intellectual Development of Europe Vol. II, P. 42)

মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর মিনার গির্জার ঘণ্টাঘরে পরিণত করা হয়। কারণ, স্পেনিশরা জানত না, এটা অন্য কাজেও ব্যবহার করা যায়।

যারা এ মিনার নির্মাণ করেছিলেন তারা পৃথিবীবাসীর সঙ্কীর্ণতা জানতেন। পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতিচিহ্ন মোছা যাবে। এজন্য তারা নিজেদের অমোছনীয় স্মৃতি আসমানে রেখে যান, মহাকাশে গ্রহের নাম পড়ুয়া পাঠক আজও তাদের অক্ষয় স্মৃতি দেখতে পায়। (History of the Intellectual Development of Europe Vol. II, P. 42)

ফিলিপ কে. হিট্টি লেখেন–

Arab astronomers have left on the sky immortal traces of their industry which every one who reads the names of the stars on an ordinary Celestial sphere can readily discern. Not only are most of the star names in European languages of Arabic origin, such as Acrab (aqrab, scorpion), Algedi (al-Jadi, the kid) Altair (al-tair, the flyer) Deneb (dhanab, tail), Pherkad (farqad, calf) but a number of technical terms, including "azimuth" (al-sumut) "nadir" (nazir) "zenith" (al-samt), are likewise of Arabic etymology and testify to the rich legacy of Islam to Christian Europe. (History of the Arabs P. 572-573)

আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের অমর স্মৃতি আকাশের বুকে রেখে যান। মহাকাশে গ্রহের নাম যে পড়ে সেই সহজে তা চিহ্নিত করতে পারবে। শুধু এটুকুই নয় যে, ইউরোপীয় ভাষায় অধিকাংশ গ্রহের নাম আরবী-মূলের। যেমন, Acrab (عقرب) Algedi (الجدي) Altair (الطائر) Deneb (ذنب) Pherkad (فرقد) এ সবগুলোর মূল আরবী, বরং অনেক শাস্ত্রীয় পরিভাষা azimuth (السموات) nadir (نظير) zenith (السمت) ইত্যাদিও আরবী থেকে নিঃসৃত। যেগুলো ইসলামের মূল্যবান উত্তরাধিকারের সাক্ষী, যেগুলো খ্রিস্টান ইউরোপ লাভ করেছে। •

আলকাউসার ভলিউম

আলহামদুলিল্লাহ, মাসিক আলকাউসার ২০০৫ থেকে ২০১৭ মোট ১৩ সালের ভলিউম পাওয়া যাচ্ছে।

বোর্ড বাঁধাই ভালিউম-এর মূল

২০০৫ = ২৪০/-
২০০৬ = ২৪০/-
২০০৭ = ২৪০/-
২০০৮ = ২৪০/-
২০০৯ = ২৪০/-
২০১০ = ২৪০/-
২০১১ = ২৪০/-
২০১২ = ২৪০/-
২০১৩ = ২৪০/-
২০১৪ = ২৪০/-
২০১৫ = ২৪০/-
২০১৬ = ২৪০/-
২০১৭ = ২৪০/-

ডাকে নিতে চাইলে প্রতিটির ডাক খরচ ১৫/- (পনের টাকা) যোগ হবে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৪৪
০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৩৩

হযরতজীগণের হেদায়েতের আলোকে

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে ব্যক্তি নয় কাজই মুখ্য

রাইয়ান বিন লুৎফুর রহমান

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। [দ্র. সূরা মায়িদা (৪) : ৩] কিয়ামত পর্যন্ত তিনি নিজে এই দ্বীন এবং এই দ্বীনের সূত্র হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। [দ্র. সূরা হিজর (৪৯) : ৯] তিনি এই ঘোষণাও করেছেন যে, এই দ্বীনকে অন্য সকল ধর্ম ও মতাদর্শের উপর বিজয়ী করবেন। [দ্র. সূরা সফ (৬১) : ৯]। এই দ্বীনের হেফাযত ও সংরক্ষণ এবং এর প্রচার-প্রসারের জন্য যখনই যে ধরনের খেদমতের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু বান্দার অন্তরে সে প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নববী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে খেদমতে দ্বীন ও নুসরতে দ্বীনের যত কাজ হয়েছে সেদিকে তাকালে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যুগ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যত কাজ হয়েছে, সবই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে গায়েবী ব্যবস্থাস্বরূপ ছিল এবং যাঁদের দ্বারা এসকল বিশাল বিশাল কর্ম সম্পাদন হয়েছে, তাঁরা শুধু উসীলা বা মাধ্যমই ছিলেন। এটা যেন আল্লাহর রাসূলের এই হাদীসেরই বাস্তব রূপ- 'আল্লাহ তাআলা সর্বদা এই দ্বীনের মধ্যে কিছু চারা রোপণ করতে থাকেন, যাদেরকে তিনি তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করেন।' -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭৭৮৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩২৬

বিগত শতাব্দীতেও আল্লাহ তাআলা এতদঞ্চলে এ ধরনের অসংখ্য নমুনা কায়েম করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ.-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত তাবলীগ জামাত দ্বারা সমগ্র বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ অসাধারণ উপকার লাভ করেছে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. তাঁর এই দাওয়াতী নেযামের নিরাপদ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বেশ কিছু উসূল ও নিয়মের পাবন্দ ছিলেন, সাথীদেরকেও পাবন্দ বানিয়েছিলেন। বিশেষ করে অতীতের বিভিন্ন দ্বীনী তাহরীক থেকে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, কোনোভাবেই এই দাওয়াতী মেহনত যেন তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে পরিচালিত না হয়। কেননা এতে ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে আন্দোলনেরও অপমৃত্যু ঘটার আশংকা থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাবলীগী জলসা ও ইজতিমাসমূহে যিনি বয়ান করেন তাঁর নাম ঘোষণা করা হয় না। উদ্দেশ্য এটাই যে, এই মেহনতের কর্মীগণ যাতে কাজের পরিবর্তে কোনোভাবেই কোনো ব্যক্তি বিশেষকেই যেনো মূল লক্ষ্য না বানিয়ে ফেলে এ প্রসঙ্গে এই দাওয়াতী মেহনতের তিন প্রাণপুরুষ হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ., হযরত মাওলানা ইউসুফ রাহ., হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান রাহ.-এর কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হল।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নূমানী রাহ. লিখেছেন-

مولانا کی سیرت وسوانح کے سلسلے میں ہم عرصے تک متأمل رہے، مولانا اس کی ہمیشہ تاکید فرماتے رہے کہ ان کی دعوت کو ان کی شخصیت کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے، وہ کسی طرح اس کے روادار نہ تھے کہ ان کی شخصیت کی طرف دعوت دی جائے اورآخر میں اس کو بھی پسند کرتے تھے کہ دعوت کے تعارف کے سلسلے میں ان کا نام بھی لیاجائے، یہ احتیاط، تواضع، بے نفسی اور اخلاص کے علاوہ اہم دینی مصالح پر مبنی تھی۔

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস রাহ.-এর জীবন-চরিত সংকলন প্রশ্নে দীর্ঘদিন আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কেননা সবসময় তিনি দাওয়াতকে তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে যুক্ত না করার কথা জোর তাগিদ দিয়ে বলতেন, তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে মানুষকে দাওয়াত দেয়া কোনোক্রমেই তিনি বরদাশত করতেন না। এমনকি শেষদিকে তো দাওয়াতের পরিচিতি প্রসঙ্গেও তাঁর নাম উল্লেখ করা হোক- এটা তিনি অপছন্দ করতেন। বিনয়, আত্মবিলোপ ও ইখলাস ছাড়াও এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দ্বীনী হিকমতও ছিল। (ভূমিকা : হযরত মাওলানা ইলিয়াস রাহ. আওর উনকী দ্বীনী দাওয়াত, পৃ. ৩৬)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ বিষয়ে বড় হযরতজীর অবস্থান কতটা মজবুত ছিল। শুধু তিনি নন, দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রাহ.-ও এই উসূলের বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। কোনোভাবেই এই দাওয়াতী মেহনত এবং তাবলীগী ইজতিমাসমূহ যাতে তাঁর ব্যক্তিত্বনির্ভর না হয়ে যায় এদিকে খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। এ বিষয়ে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তৎক্ষণাৎ সাথীদের সাবধান করে দিতেন। একবার এক ইজতিমা অনুষ্ঠিত হওয়া হযরতজীর উপস্থিতির উপর নির্ভর করছিল। অংশগ্রহণ না করলে ইজতিমার আয়োজকদের অসন্তুষ্টির আশংকা ছিল। এই প্রেক্ষাপটে হযরতজী ইউসুফ ছাহেব রাহ. এক গুরুত্বপূর্ণ পত্র লেখেন, যা নিচে উল্লেখ করা হল। তিনি লেখেন-

کئی دن کی رد وقدح وصلاح ومشورے کے بعد استخارہ کر کے اور کرلکے یہی چیز سمجھ میں آئی کہ اپنی ذات پر جو اجتماعات کا رخ پرتا چلا جارہا ہے اگر چہ اس میں فوری طور پڑ اجتماع کے موقع پر احباب میں عمومی تاثر پیدا ہوجاتا ہے اور اوقات کی تفریغ کی بھی عام مجمع میں صورت پیدا ہو جاتی ہے مگر اس کی بقا کے لئے اس ماحول کے پرانے احباب کے یہاں آنے کی صورتیں قابو نہیں آتیں۔ اسلئے اس عمل کے سطحی ہونے اور اپنے نازک اصولوں سے ہٹ جانے کا قوی خطرہ ہے جو خیر کے متوجہ ہونے اور رحمت کے دروازے کھلنے کے بجائے مضرت اور شر کے متوجہ ہونے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے علاوہ ازیں ایک کام جو اس زمانے میں عنقا ہے جماعت کی ایک مخصوص جد وجہد کے ذریعے اسکی شکلیں اللہ رب العزّت بڑھا رہے ہیں جماعت اور مخصوص جدو جہد سے ذہن ہٹ کر شخصیّت اور تقریروں کی طرف ذہنوں کے امالہ کی صورتیں اجتماعات سے پیدا ہورہی ہیں جو شخص اور کام دونوں کی اضاعت کے مرادف ہے اور خطرے کا باعث ہے، دوچار دن میں ان ساری شکلوں اور نزاکتوں پر کیسے ایک مجمع کو ڈالا جاسکتا ہے جن کی رعایت کے بیرا یہ کام اپنے میں رحمتوں کو لئے ہوئے نہیں ہے، بندہ کی

غیر موجودگی اگرچہ طبائع پر شاق ہے مگر جماعت کی محنت کے لئے ایک موقع ہے۔

কয়েকদিন যাবৎ আলোচনা-পর্যালোচনা ও পরামর্শের পরে ইসতেখারা করে এবং অন্যদের দ্বারা করিয়ে এই কথাই বুঝে এসেছে যে, ইজতিমাসমূহের রোখ যে (আমার) নিজের দিকে হচ্ছে, এতে যদিও তাৎক্ষণিকভাবে ইজতেমায় সাথীদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব হয় এবং আম-মজমায় সাথীদের সময় ফারেগ করারও সুরত পয়দা হয়, কিন্তু এটা অব্যাহত থাকার জন্য এই মেহনতের পুরান সাথীদের এখানে আসার বিষয়টা সীমার ভিতরে থাকে না।

এ কারণে এর মধ্যে সাতহিয়্যাত বা অগভীরতা পয়দা হওয়ার এবং এর নাযুক উসূলসমূহ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পূর্ণ আশংকা থাকে, যা কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়া এবং রহমতের দরজা খোলার পরিবর্তে ক্ষতি এবং অনিষ্টের দিকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও একটি কাজ, যা বর্তমান যামানায় একেবারে দুর্লভ, জামাতের বিশেষ চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এর পরিধি দিন দিন আল্লাহ বৃদ্ধি করছেন, এই অবস্থায় জামাত এবং বিশেষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে ইজতিমাগুলোতে বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ বয়ানের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা সাথীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, যা ব্যক্তি এবং কাজ উভয়টির জন্য ক্ষতিকর এবং ধ্বংসাত্মক। দুই-চার দিনের মেহনতে মজমাকে এসব উসূল ও মানসিকতার উপর কীভাবে উঠানো যেতে পারে, যা লক্ষ না করলে এই কাজ আমাদের জন্য রহমত নিয়ে আসবে না? আমার অনুপস্থিতি যদিও অনেকে মন মেনে নিতে পারছে না, কিন্তু এখন জামাতওয়ার মেহনতের মওকা তৈরি হল। (সাওয়ানেহে হযরত মাওলানা ইউসুফ কান্ধলভী রাহ., পৃ. ৭৫৪-৭৫৫)

উপরোক্ত চিঠি থেকেই বোঝা যায় হযরতজী ইউসুফ রাহ. তাবলীগী ইজতিমাগুলোতে মেহনত-মোজাহাদার পরিবর্তে বিশেষ ব্যক্তির উপস্থিতি এবং তাঁর বয়ানের প্রতি সাথীদের অত্যধিক গুরুত্বারোপকে কতটা অপছন্দ করেছেন এবং একে ব্যক্তি ও কাজ উভয়ের জন্য ধ্বংসাত্মক আখ্যায়িত করেছেন।

প্রথম দুই হযরতজীর ন্যায় তৃতীয় হযরতজী মাওলানা ইনআমুল হাসান রাহ.-ও এই তাবলীগী মেহনতকে তাঁর ব্যক্তির সাথে যুক্ত না করার প্রতি জোর তাকিদ করেছেন এবং ইজতিমাসমূহে তাঁর অনুপস্থিতিকে উপস্থিতি অপেক্ষা অধিক উপকারী বলেছেন।

১৩৯৬ হিজরী মোতাবেক ১৯৭৬ ঈসাব্দ সালে পরামর্শের ভিত্তিতে হযরতজী সিদ্ধান্ত নিলেন এই বছর বাংলাদেশের ইজতিমায় উপস্থিত হবেন না। সেই উপলক্ষে হযরতজী ইনআমুল হাসান রাহ. বাংলাদেশের আহলে শুরার উদ্দেশে (২১ রবিউল আওয়াল ১৩৯৬ হি. মোতাবেক ২৩ মার্চ ১৯৭৬ ঈ. তারিখে) একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখে পাঠান, যা নিচে উল্লেখ করা হল। তিনি লেখেন-

بندہ نے تمام احباب سے بہت ہی زیادہ رائے لی آپ کے یہاں کے لئے، مگر کسی کی بھی رائے نہ ہوئی۔ بندہ گو جسمانی حاضری نہ دے گا لیکن بندہ کی دعا اور دل کی پکار آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہی کرنے والاہے، بندہ آئے تب بھی اور نہ آئے تب بھی، بلکہ اپنی عدم حاضری بعض وجوہ سے حاضری سے زیادہ مفید ہے، حاضری میں مخلوق پر نظر آسکتی ہے، غیر حاضری میں صرف خالق پر نظر جمنے کا قوی امکان ہے، حاضری میں بوجھ اوروں پر ہو سکتاہے، غیر حاضری میں سارا بوجھ آپ سب پر ہوگا جو تمام فتوحات غیب کے لئے مفتاح کا کام دے سکے گا۔

'বান্দা আপনাদের এখানে আসার বিষয়ে সমস্ত আহবাবের রায় নিয়েছি। কিন্তু কোনো সাথী এখানে আসার পক্ষে মত দেননি। এ কারণে বান্দা এবার জিসমানীভাবে হাজিরা দিতে পারছি না। কিন্তু বান্দার দিল এবং দুআ আপনাদের সাথে থাকবে। বান্দা আসুক বা না আসুক তাতে কী আসে যায়, করবেন তো আল্লাহ তাআলা।

বরং অনেক দিক থেকে আমার অনুপস্থিতি, উপস্থিতি অপেক্ষা অধিক উপকারী। কেননা উপস্থিত হলে মাখলুকের উপর নযর আসতে পারে। কিন্তু অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে শুধু খালেকের উপর নযর থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আমি উপস্থিত হলে ভার অন্যের উপর থাকবে। অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে সমস্ত ভার আপনাদের উপর থাকবে, যা সমস্ত গায়বী মদদের চাবিকাঠি।' (সাওয়ানেহে হযরতজী ছালেছ মাওলানা ইনআমুল হাসান রাহ. খ. ৩ পৃ. ১৭৮)

মোটকথা প্রত্যেক হযরতজী এই বিষয়ে ফিকিরমান্দ ছিলেন যে, এই তাবলীগী মেহনত যেন তাঁদের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে পরিচালিত না হয়। বিশেষ করে ইজতিমাসমূহে তাঁদের উপস্থিতির প্রতি সাথীরা যেন অত্যধিক গুরুত্বারোপ না করে- এ বিষয়ে তাঁরা আরো বেশি সতর্ক ছিলেন। কিন্তু কেন যেন সাথিরা আজকাল বড়দের এই উসুল বোঝারই চেষ্টা করছে না, আল্লাহ মাফ করুন। কোনো কোনো সাথীর যবানে এমন কথাও শোনা যায়- 'অমুক মুরব্বী যদি ইজতিমায় না আসেন তবে আমরা ইজতিমাই করব না।' নাউযুবিল্লাহ। আবার কোনো কোনো সাথীকে দেখা যায়, কোনো মুরব্বী না আসলে ইজতিমার মাঠ ছেড়েই চলে যান। এই মেযাজ ও চিন্তা তিনই হযরতজীর মেযাজ ও চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবধরনের প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত হয়ে মধ্যপন্থার উপর অবিচল থেকে সবধরনের দ্বীনী খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কুরআনুল কারীম সংখ্যা

মাসিক আলকাউসারের সর্বপ্রথম বিশেষ সংখ্যা

কয়েকটি বিশেষ শিরোনাম

কুরআন মাজীদের আয়াত সংখ্যা : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

কুরআনের পরিচয় কুরআনের ভাষায়
মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

অর্থ ও অর্থনীতি : কুরআনের নির্দেশনা
মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

কোরআনের সংস্পর্শ ছাড়া মানবজনম অর্থহীন
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

কুরআন একটি স্বচ্ছ আয়না
মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.

কুরআন অনুধাবন : কিছু করণীয়
মাওলানা আব্দুল মতিন

তাফসীরে মাজেদী : স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য
ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

কুরআনে কারীমের সাথে আমার মহব্বতের শুরু হযরত ক্বারী সাহেবের উসিলায়
হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান

আমাদের নেছাবে তালীমে কোরআনুল কারীম
মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

এখনও যারা কুরআনুল কারীম সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারেননি নিচের নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২ মূল্য ১২০/-

০১৯৮৪-৯৯ ৮৮ ৩৩

Scanned by CamScanner

'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'

শিব্বীর আহমদ

এ শিরোনামটি আমাদের বাংলা ভাষার এক চিরায়ত প্রবাদ। লোভ করলে পাপ হয়, আর পাপ মরণ ডেকে আনে। এই তো এর সাদামাটা মর্ম। লোভ মানুষের এক স্বভাবজাত বিষয়। স্বভাব ও চরিত্রের অন্যান্য মন্দ বিষয়ের মতো এই লোভকেও তাই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নিয়ন্ত্রণহীন লোভ পরিণতিতে ধ্বংস ডেকে আনবেই। লোভ যে কতটা ভয়াবহ পরিণতির মুখে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে পারে এর নজির তো আমরা প্রতিদিনই পাই। আমাদের পত্রিকার পাতাগুলোতে অন্য কিছুর সংবাদ থাকুক আর না থাকুক, লোভের এ জঘন্য পরিণতির কথা থাকাটা যেন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। যত দুর্নীতি, সবকিছুর মূলেই তো এই মরণব্যাধি লোভ। এইডসের মতোই একটি ঘাতক ব্যাধি লোভ। ক্ষমতার দাপটে, অর্থ-বিত্তের দাপটে, পদমর্যাদার দাপটে মানুষ নির্দ্বিধায় এ লোভকে কাজে লাগায়। ওঠাবসা চলাফেরায় দুর্নীতিই হয় তার সঙ্গী। এ সঙ্গলাভের ফল হিসেবে দুনিয়ার আদালতেই তাকে দাঁড়াতে হয় আসামীর কাঠগড়ায়। যে যত দাপটের সঙ্গেই দুর্নীতি করে যাক, দুর্নীতির জাল সে যতদূরই ছড়িয়ে দিক, এ পৃথিবী তাকে আসামী বানিয়েই ছাড়ে। এটাই স্বাভাবিকতা। আমাদের এই একবিংশ শতাব্দীর কথাই যদি বলি, কিংবা আরও ছোট করে যদি শুধু শেষ হতে চলা ২০১৭ সালের কথাই বলি, তবুও কি এর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে কম? কি দেশে আর কি বিদেশে, সর্বত্রই এই দৃশ্য। দীর্ঘ চার দশকের জনপ্রিয় রাষ্ট্রনায়ক লোভের আঘাতে ছিটকে পড়েন সিংহাসন থেকে। কোটি কোটি টাকার মালিক যারা, তাদের নামে দায়ের হয় দুর্নীতির মামলা। গতকাল যিনি রাজক্ষমতা আঁকড়ে ধরে উড়ে বেরিয়েছেন সদাসর্বত্র, তাকে আজ ঘুরে ঘুরে যেতে হয় বিচারকের এজলাসে। দুদিন আগের প্রতাপশালী রাষ্ট্রপতি এখন দুর্নীতির অপরাধে গৃহবন্দী। এমন আরও কত কী!

আসল কথা কী, লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা সেখানে বেকার। তাই তো আমরা দেখি, দুর্নীতির যত অভিযোগ, সবই সম্পদশালীদের বিরুদ্ধে। বরং যে যত বেশি দুর্নীতিপরায়ণ, সে ততটাই সম্পদশালী। এই জগতে হায়, সেই বেশি চায়, যার আছে ভূরি ভূরি।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট করেছেন এভাবে–

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثٌ، وَلاَ يَمْلَأُ فَاهُ إِلاَّ التُّرَابُ

আদমসন্তানের যদি দুই উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, তাহলে সে কামনা করে– তার যদি আরেকটি উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণ থাকত! মাটি ছাড়া কোনো কিছুই তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে না! –জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৩৭

লোভের একটা স্তর তো এমন– কেউ অর্থসম্পদের পেছনেই তার জীবনকে ব্যয় করে দিল। নাওয়া-খাওয়া জীবনের সুখ-আরাম ভুলে গিয়ে কেবলই টাকা আর টাকা! অধিক সম্পদ উপার্জনের লোভে যে এভাবে নিজেকে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিলিয়ে দেয়, নিজের উপার্জিত টাকা সে আর ভোগ করে যেতে পারে না। এখানে অবশ্য ব্যক্তি কেবল তার নিজের আরামকেই হারাম করে, অন্য কেউ তার দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

লোভের আরেকটি স্তর হচ্ছে– নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে অন্যকে আক্রান্ত করা, প্রভাব খাটিয়ে কিংবা কোনো কৌশলে অন্যের সম্পদ হাতিয়ে নেয়া। লোভের উপরোক্ত প্রথম স্তরটিও প্রশংসনীয় নয় মোটেও, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটি সম্পূর্ণই হারাম। বলে-কয়ে হোক আর গোপন চক্রান্তের মাধ্যমে হোক, সর্বক্ষেত্রেই তা নিন্দনীয়, অবৈধ। এ লোভই মানুষের পতন ডেকে আনে। দাপট হয়তো কিছুকাল তাকে সঙ্গ দেয়। কিন্তু একসময় তাকে পতনের মুখে পড়তেই হয়।

তবে এটাও অনস্বীকার্য– জীবনে চলতে গেলে টাকা লাগেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই সমাধান দিচ্ছেন–

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ

হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উপার্জনে সহজতা অবলম্বন করো। জেনে রেখো, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার জন্যে নির্ধারিত রিজিক পূর্ণ না করে ততক্ষণ তার কিছুতেই মৃত্যু হবে না। একটু দেরিতে হলেও তা তার কাছে পৌঁছবেই। তাই আল্লাহকে ভয় করো। উপার্জনে সহজতা অবলম্বন করো। হালাল যতটুকু তা গ্রহণ করো আর যা কিছু হারাম তা বর্জন করো। –সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৪৪

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লোভের দুটি স্তর থেকেই বেঁচে থাকার পথ নির্দেশ করেছেন। তিনি একদিকে উচ্চারণ করেছেন আশ্বাসবাণী– তোমার জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যতটুকু রিজিক নির্ধারিত, তা তুমি পাবেই। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে তুমি তা ভোগ না করবে ততক্ষণ তোমার মৃত্যু হবে না। এই বিশ্বাস বুকে ধারণ করে তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলো আর সহজে যতটুকু সম্ভব উপার্জনের চেষ্টা করো। উপার্জনের পেছনে পড়ে তুমি তোমার জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়ো না। এ জীবন অনেক মূল্যবান; একে কাজে লাগিয়েই তোমাকে অর্জন করতে হবে মৃত্যু-পরবর্তী অনন্ত জীবনের পাথেয়। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন, উপার্জন করতে গিয়ে হালাল-হারাম দুটি পথেরই তুমি সন্ধান পাবে। আল্লাহকে ভয় করে সর্বপ্রকার হারাম থেকে তুমি বেঁচে থেকো। হালাল পন্থায় যতটুকু সম্ভব হয় ততটুকুই তুমি অবলম্বন করো। হয়ত একটু বিলম্ব হবে, কিন্তু তোমার নির্ধারিত রিজিক তোমার কাছে আসবেই।

সম্পদের প্রতি এই লোভের একটি অনিবার্য ফল– সম্পদ অর্জনে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। এর সঙ্গে যোগ হয় একজনকে ঠকিয়ে আরেকজনের এগিয়ে যাবার মানসিকতা; হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করে শুধুই সম্পদ বাড়ানোর প্রবণতা। জন্ম নেয় একের মনে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি। এভাবে একটি মন্দ বিষয় আরও অনেক মন্দ বিষয়ের সূত্রপাত ঘটায়। আর একে একে যখন কেউ আক্রান্ত হয় লোভ হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি রোগে, তখন তার পতন ঠেকাবার উপায় কোথায়! এভাবেই মনের কোণে লালিত লোভ একসময় ভয়ানক রূপ ধারণ করে এবং ধীরে ধীরে ধ্বংসের দুয়ার খুলে দেয়।

দুনিয়াতে যেমন লোভ একরাশ মন্দত্বের সূচনা করে, একইভাবে তা দ্বীন-ধর্ম ও পরকালকেও বরবাদ করে দেয়। ওই যে বলে

Scanned by CamScanner

এলাম, লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয় এবং তার বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে যায়, ওই সময়ে সে যা কিছুই করে, বিবেকের কাঠগড়ায় আসামীরূপে তাকে দাঁড়াতে হয় না। তখন তার কাছে কোনো অপরাধই অপরাধ মনে হয় না। সেসময় যেমন সে কালো টাকা হাতিয়ে নিতে থমকে দাঁড়ায় না, ঠিক তেমনি প্রয়োজন হলে দ্বীন-ধর্ম উপেক্ষা করতে, এমনকি কখনো ছেড়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সম্পদের নেশায়, সচ্ছল জীবন লাভের আশায় আমাদের এই দেশেই তো কত মানুষ খ্রিস্টান মিশনারীদের পাতা জালে জড়িয়ে যাচ্ছে!

নবীযুগের একটি দৃষ্টান্ত দিই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদীনায়। সেসময় নাজরান ছিল খ্রিস্টানদের এলাকা। সেখান থেকে ষাট সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রওয়ানা দিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে। তাদের মধ্যে তিনজন ছিল খুবই গণ্যমান্য। একজন ছিল সর্বাধিক বিজ্ঞ, যে কোনো কাজে অন্যরা তার পরামর্শই মেনে চলত। আরেকজন ছিল তাদের আলেম। তৃতীয়জন ছিল পাদ্রী এবং তাদের ধর্মীয় নেতা। তার নাম আবু হারেসা। অনন্য মর্যাদার অধিকারী এক ব্যক্তি। তৎকালীন পরাশক্তি খ্রিস্টান রাষ্ট্র রোমও তাকে অনেক মর্যাদার আসনে আসীন করেছিল। তাঁকে ধনসম্পদে ভরে তুলেছিল। তার জন্যে তারা গীর্জা বানিয়ে দিয়েছিল। খ্রিস্টান ধর্মে তার জ্ঞান ও পারদর্শিতায় রোমবাসী ছিল যারপরনাই মুগ্ধ। যাই হোক, এই কাফেলা যখন নাজরান থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হল, তখন হঠাৎ করেই আবু হারেসাকে বহনকারী খচ্চরটি তাকে নিয়ে পড়ে গেল। তখন পাশে থাকা তার সহোদর কুরয বলে উঠল : تَعِسَ الْأَبْعَدُ অর্থাৎ মুহাম্মাদ ধ্বংস হোক। আবু হারেসা তখন শাসিয়ে তাকে বললেন, তুমি ধ্বংস হও! অবাক হয়ে কুরয তার কাছে জানতে চাইল– কেন ভাই? আবু হারেসা বললেন, আল্লাহর কসম, তিনিই তো সেই নবী, আমরা যার জন্যে প্রতীক্ষমাণ। কুরযের পাল্টা প্রশ্ন– আপনি যদি তা জেনেই থাকেন, তাহলে কেন আপনি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন না? আবু হারেসার সোজা জবাব– এই যে রোমবাসী আমাদেরকে এত সম্মান করছে, আমাদেরকে নেতা বানিয়ে রাখছে, অর্থকড়ি দিচ্ছে, এই খ্রিস্টধর্ম অনুসরণ না করলে তো তারা এগুলো করবে না। আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে তারা এই অর্থসম্পদ ইজ্জত-সম্মান সবই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।... (আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৩৯০৬; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৬৬৫ (৩/৪২) আহলে নাজরানের প্রতিনিধিদল শিরোনাম দ্রষ্টব্য; তাফসীরে রাযী, সূরা আলে ইমরানের প্রারম্ভিক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

এ তো খ্রিস্টানদের একটি দল কিংবা বিশেষ একজন ব্যক্তির ঘটনা। কিন্তু পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে ব্যাপকভাবেই আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিস্টানদের এ চরিত্রের কথা বলা হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

সত্যি, যারা আল্লাহর (সঙ্গে কৃত) অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে, পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই; এবং আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, কিয়ামতের দিন তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ৭৭

তাওরাত ও ইঞ্জিলে যে শেষ নবীর আগমনের কথা বলা হয়েছে, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যে সে শেষ নবী, এ নিয়ে ইহুদী-খ্রিস্টানদের কোনো সন্দেহ ছিল না। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন–

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাঁকে চিনে, যেমন তারা তাদের ছেলেসন্তানদের চেনে। আর তাদের একটি দল জেনেশুনেই সত্যকে লুকিয়ে রাখছে। –সূরা বাকারা (২) : ১৪৬

প্রথম জীবনে ইহুদী আলেম থেকে পরবর্তী জীবনে বরেণ্য সাহাবী হয়ে ওঠা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-কে হযরত উমর রা. জিজ্ঞেস করেছিলেন–

أَتَعْرِفُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَعْرِفُ ابْنَكَ؟

আপনি কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপনার ছেলের মতোই চেনেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন–

نَعَمْ وَأَكْثَرَ

তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস বরং আমার ছেলের চেয়েও বেশি। আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরীল আলাইহিস সালামকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যাবলিসহ পাঠিয়েছিলেন। সেসব বৈশিষ্ট্যের আলোকেই আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু আমার ছেলের বিষয়ে তো আমার নিশ্চিত জানা নেই, তার মা কী করেছে! (দ্র. তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারা, আয়াত ১৪৭-এর অধীনে)

তারা সুনিশ্চিতভাবেই চিনতেন– মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তাওরাত-ইঞ্জিলে বর্ণিত শেষ নবী। হযরত মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালামকে সমর্থনকারী তিনিই সেই রাসূল। অথচ নিজেদের নেতৃত্ব হারানোর আশংকায়, পার্থিব সম্পদের লোভে তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেয়নি। এভাবেই দুনিয়ার প্রতি লোভ তাদের দ্বীন ও আখেরাত বরবাদ করে দিয়েছিল। এ ধারা এখনো চলমান। অধিক সম্পদ উপার্জনের নেশায় হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করা, ধর্মীয় বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করার দৃষ্টান্ত আমরা যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখতে পাই। আল্লাহ তাআলার আদেশ চিরন্তন–

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। তোমরা যদি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি কর তাহলে আল্লাহর কাছে যে প্রতিদান আছে তোমাদের জন্যে তা-ই শ্রেয়। তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব। –সূরা নাহল (১৬) : ৯৫-৯৬

মানুষ যেমন সম্পদের প্রতি লোভ করে, তেমনি মর্যাদা ও সম্মানের প্রতিও লোভ করে। পদমর্যাদার প্রতি লোভ কখনো সম্পদের লোভের চেয়েও ভয়ানক হয়ে পড়ে। এ মর্যাদা পার্থিব বিষয় নিয়েও হতে পারে, হতে পারে দ্বীনি বিষয়েও। যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক, এ লোভও মানুষের পতন ত্বরান্বিত করবেই। জাগতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মান ও মর্যাদার আসন চেয়ে নিয়ে মানুষকে যে কতটা অপমান আর অসম্মান সঙ্গে করে সে পদ থেকে নেমে যেতে হয় তা তো আমাদের চোখে দেখা এক বাস্তবতা।

Scanned by CamScanner

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী–

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি কখনোই নেতৃত্ব চেয়ো না। কারণ তুমি যদি চাওয়ার পর তা পাও তাহলে এর পুরো দায়িত্ব তোমার ওপরই ন্যস্ত করা হবে। আর না চেয়ে যদি তুমি তা পাও তাহলে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) তোমাকে সে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৬২২

মর্যাদার প্রতি লোভেরই একটি দিক– মানুষের প্রশংসা শুনতে চাওয়া। এটাও মানুষের একটা স্বভাবজাত বিষয়। অন্যরা যখন প্রশংসা করে তা শুনতে ভালো লাগে। কিন্তু সংকট হয় তখন যখন কেউ কোনো কাজ না করেও সে জন্য প্রশংসা শুনতে চায় কিংবা কেউ তার প্রশংসা না করলে তাকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা এমন–

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّ يُحِبُّونَ أَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

যারা নিজেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে উৎফুল্ল এবং যা তারা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে ভালোবাসে তুমি অবশ্যই তাদেরকে ভাববে না যে, তারা আজাব থেকে বেঁচে যাবে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৮

মর্যাদার প্রতি লালসা যখন দ্বীনি কোনো বিষয় নিয়ে হয়, কোনো ইবাদত করে কেউ যখন মানুষের কাছে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার পাত্র হতে চায়, দান-সদকা করে, বারবার হজ্ব-ওমরা আদায় করে কিংবা কাড়ি কাড়ি ইলম শিখে কেউ যখন অন্যদের দৃষ্টিতে সম্মানের আসনে বসতে চায়, তার মুক্তির তখন কোনো উপায় থাকে না। কুরআন-হাদীসের ঘোষণা অনুসারে দোজখই তার ঠিকানা! এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের বিষয়ে ফয়সালা করা হবে, তাদের একজন শহীদ, একজন আলেম এবং একজন দান-সদকাকারী। শহীদকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি তাকে তাঁর নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তাতে কী আমল করেছ? সে উত্তর দেবে, আপনার পথে লড়াই করতে করতে আমি শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং লড়াই করেছ– যেন তোমাকে সাহসী বীর যোদ্ধা বলা হয়। এটা তো তোমাকে বলা হয়েছেই। তখন আল্লাহর আদেশে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর আলেমকে নিয়ে আসা হবে, যে নিজে ইলম শিখেছে, অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছে। তিনি তাকে তাঁর নিআমতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তাতে কী আমল করেছ? সে উত্তর দেবে, আমি নিজে ইলম শিখেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং কুরআন তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি ইলম শিখেছ যেন তোমাকে আলেম (আল্লামা) বলা হয়। কুরআন পড়েছ যেন তোমাকে কারী বলা হয়। এগুলো তো বলা হয়েছেই। তখন আল্লাহর আদেশে তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।

এরপর নিয়ে আসা হবে ওই দানসদকাকারীকে, যাকে আল্লাহ প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। তিনি তাকে তাঁর নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি তাতে কী আমল করেছ? সে উত্তর দেবে, আপনি পছন্দ করেন এমন কোনো পথ নেই যেখানে আমি দান করিনি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং দান করেছ যেন তোমাকে দানবীর বলা হয়। এটা তো বলা হয়েছেই। তখন তাকেও আল্লাহর আদেশে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৫

এই হচ্ছে লোভ। মোটকথা, অর্থ-সম্পদ নিয়ে হোক, আর সম্মান-মর্যাদা নিয়ে হোক, সকল লোভের ক্ষেত্রে সমানভাবে এ কথা প্রযোজ্য– লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। অথচ আল্লাহ তাআলা যেভাবে মানুষের হায়াত-মওত সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা যেমন সুনির্ধারিত, ঠিক তেমনি প্রতিটি মানুষের জন্যেই তার রিজিকও নির্ধারিত। এর ব্যতিক্রম হওয়ার সুযোগ নেই। ওপরের এক হাদীসে আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এ নির্ধারিত রিজিক দুনিয়াতে পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার আগে কিছুতেই কারও মৃত্যু হবে না। তাহলে আর লোভের পেছনে ছোটা কেন? অন্যের সঙ্গে শুধুই সম্মান আর সম্পদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা কেন? মুমিন বান্দার উচিত, নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের সামনে সঁপে দেয়া। 'দারুল আসবাব' এ দুনিয়াতে সহজতার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব উপকরণ অবলম্বন করে প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিষয় পুরোটাই আল্লাহ তাআলার হাতে ন্যস্ত করা।

আর প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাকওয়া ও আল্লাহর ভয়কে অবলম্বন করে চলা। আল্লাহ তাআলার ঘোষণায় কোনো অস্পষ্টতা নেই–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহলে তিনি তার জন্যে কোনো পথ তৈরি করে দেবেন এবং তাকে তিনি এমন স্থান থেকে রিজিক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। –সূরা তালাক (৬৫) : ২-৩

আর মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا.

যে ব্যক্তি মর্যাদা লাভ করতে চায়, (সে জেনে রাখুক–) সমস্ত মর্যাদা আল্লাহরই হাতে। –সূরা ফাতির (৩৫) : ১০

লোভের অবশ্য প্রশংসনীয় কিছু ক্ষেত্রও আছে। যেমন, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا.

লোভাতুর ও তৃষ্ণার্ত দুই ব্যক্তি, যারা কখনোই তৃপ্ত হয় না– ইলম অর্জনে যে নিমগ্ন, তার লোভ কখনো শেষ হয় না, দুনিয়া অর্জনে যে লিপ্ত, সেও কখনো তৃপ্ত হয় না। –শুআবুল ঈমান, বায়হাকী হাদীস ৯৭৯৮

দুনিয়া অর্জনে লোভ যতটা নিন্দনীয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ইলম অর্জনে সে লোভ ঠিক ততটাই প্রশংসনীয়। কল্যাণের এমন যত খাত, লোভ কাঙ্ক্ষিত ঐ সকল ক্ষেত্রেই। •

মাদরাসা ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.

নাহু ছরফ ও আদব পড়ানো হয়।
সাধারণ কোর্স ১ বছর মেয়াদী
বিশেষ কোর্সসমূহ :
২০শে শাবান হতে ১০দিন
১লা রমযান হতে ২৫দিন
কুরবানী ঈদের পর ১০দিন
১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষার পর ৭দিন
মাওঃ আব্দুল্লাহ মোবা : ১৯৯২৭৭৬৫৬৪
পূর্ব সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

Scanned by CamScanner

প্রচলিত 'ইঞ্জিল শরীফ' কুরআনে বর্ণিত ইঞ্জিল নয়

আবু মাইসারা মুনশী মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন

তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনসহ নবীদের প্রতি নাযিলকৃত সকল কিতাব ওহী। সবই আল্লাহ তাআলার কালাম। তবে ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনে কারীম ছাড়া অন্য সকল আসমানি কিতাব বিকৃতির শিকার হয়েছে। কোনোটিই তার মূল অবস্থায় বাকি থাকেনি। তাই আমাদের ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার যে, আসমানি কিতাব তাওরাত বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের পুরনো নিয়মের প্রথম পাঁচ পুস্তক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, গণনাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ অথবা অন্য শব্দে পয়দায়েশ, হিজরত, লেবীয়, শুমারী ও দ্বিতীয় বিবরণ) নয়; বরং তাওরাত হচ্ছে সেই কিতাব, যা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দান করেছেন। যবুর কিতাবও বাইবেলের পুরনো নিয়মের 'সামসঙ্গীত' বা 'গীতসংহিতা' নয়; বরং আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তা হচ্ছে যবুর শরীফ। তেমনি আসমানি কিতাব ইঞ্জিল বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়ম কিংবা নতুন নিয়মের প্রথম চারটি কিতাব (মথি সুসমাচার, মার্ক সুসমাচার, লূক সুসমাচার ও যোহন সুসমাচার) নয়; বরং ইঞ্জিল সেই কিতাব, যা আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা ইবনে মার্‌ইয়ামকে ওহীর মাধ্যমে দান করেছেন এবং ঈসা আলাইহিস সালাম তা বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রচার করেছেন।

মোদ্দাকথা, বাইবেলের পুরনো নিয়ম ও নতুন নিয়ম (প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ)-এর কোনো গ্রন্থই ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত গ্রন্থ নয়। এগুলো পরবর্তীদের রচনা। কিন্তু এ রচনাগুলোর মূলকপিও খ্রিস্টানদের কাছে সংরক্ষিত নেই। এগুলোর রচয়িতা কে বা কারা, তাও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। বাইবেলের গ্রন্থগুলোর রচয়িতাদের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের যেসব আলোচনা তাদের ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের কিতাবাদিতে পাওয়া যায় তার সবটুকুই অনুমান ও ধারণাভিত্তিক–এ কথা খোদ খ্রিস্টান পণ্ডিত ও গবেষকগণও স্বীকার করেন। প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফের লেখকগণ কেউ ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারী ছিলেন না। তা ছাড়া এ গ্রন্থগুলো যাদের বলে দাবি করা হয় তাদের পর্যন্তও কোনো 'মুত্তাসিল সনদ' বা অবিচ্ছিন্ন-সূত্র খ্রিস্টানদের কাছে বিদ্যমান নেই।

। দুই।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন যে, কিতাবীরা আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিকৃত অংশ আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের অংশ নয়। আর যতক্ষণ বিকৃত অংশ নির্দিষ্ট করা না হবে বিকৃতি-মিশ্রিত কিতাবের উপর বিশ্বাস করা জায়েয হবে না। কিতাবীরা নিজেরা কিতাব রচনা করে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলে প্রচার করেছে–এ কথাও আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন।

আফসোস! কিতাবীরা মূল তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিল তো সংরক্ষণ করতে পারেনি, এমনকি এগুলোর বিকৃতি-যুক্ত নুসখাগুলোও সংরক্ষণ করতে পারেনি। তাদের হাতে এখন যা আছে তা বাইবেল, ঐশীগ্রন্থ নয়।

বাইবেল নামে তাদের কাছে যা রয়েছে তাও কিন্তু আপন অবস্থায় নেই। তাতেও তারা পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে। তারা বাইবেলে যে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে তাও শাব্দিক ও অর্থগত উভয় প্রকারেই হয়েছে। শাব্দিক বিকৃতির অর্থ হচ্ছে শব্দের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন করা–চাই তা এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ বসিয়ে হোক বা কোনো শব্দকে বিলুপ্ত করে কিংবা কোনো শব্দ বৃদ্ধি করে। আর অর্থগত বিকৃতির অর্থ হচ্ছে শব্দের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন না করে বাক্যের মূল অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা করা।

এই অর্থগত বিকৃতির বিষয়টি খ্রিস্টান পণ্ডিত ও গবেষকগণও স্বীকার করেন। তাদের মতে পুরনো নিয়মের পুস্তকগুলোর যেসব পদে ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, ইহুদিরা সেগুলোতে অর্থগত বিকৃতি সাধন করেছে। এমনিভাবে প্রটেস্ট্যান্টগণ স্বীকার করেন যে, পোপের অনুসারীরা (ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা) বাইবেলের পুরনো ও নতুন উভয় নিয়মের বিভিন্ন পদের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে। পোপের অনুসারীরাও এই অভিযোগ প্রটেস্ট্যান্টদের দিকে আরোপ করেছে। সুতরাং বাইবেলের পুরনো ও নতুন নিয়মে অর্থগত বিকৃতির বিষয়টি সর্বজন স্বীকৃত।

রইল বাইবেলের শাব্দিক বিকৃতি। বাইবেলে শাব্দিক বিকৃতিও হয়েছে প্রচুর পরিমাণে। কখনো এক শব্দকে অন্য শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। বাক্য থেকে কিছু শব্দ বিয়োজন করা হয়েছে। কখনো আবার বাক্য বা বাক্যাংশকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। কখনো পুরো ঘটনাকেই সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা হয়েছে। এসবই বাইবেল ও প্রচলিত ইঞ্জিলের শাব্দিক বিকৃতির বিভিন্ন রূপ। প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থের বিশুদ্ধতা ও সূত্র-বিষয়ক গবেষকগণ সঠিক ও সুদৃঢ় প্রমাণভিত্তিক দাবি করেছেন যে, ইহুদি-খ্রিস্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থে শাব্দিক বিকৃতি সাধন করেছেন এবং অনেক আধুনিক খ্রিস্টান-অখ্রিস্টান গবেষকও শাব্দিক বিকৃতির বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

। তিন।

প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফের কী অবস্থা! খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ বলতে বিশেষভাবে বাইবেলের নতুন নিয়মের ২৭টি পুস্তিকার সমষ্টিকে বুঝানো হয়, যাকে বাংলায় ইঞ্জিল শরীফ ও নবসন্ধিও বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় নিউ টেস্টামেন্ট। আরবীতে আলআহ্‌দুল জাদীদ। আর বাইবেলের নতুন নিয়মের প্রথম চারটি পুস্তিকার প্রত্যেকটিকে বাংলায় সুসমাচার ও মঙ্গলসমাচার বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় গসপেল। আরবী ও উর্দূতে বলা হয় ইঞ্জিল। যেমন মথি সুসমাচার, মথি মঙ্গলসমাচার, গসপেল অফ ম্যাথিউ, ইঞ্জিলু মাত্তা, মাত্তা কি ইঞ্জিল ইত্যাদি। বুঝা গেল ইঞ্জিল শব্দটি (আরবী ও উর্দূ যে ভাষাতেই ব্যবহার করা হোক) ইংরেজি গসপেল ও বাংলা সুসমাচার শব্দের সমার্থবোধক; নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়মের সমার্থক নয়। বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তিকার সমষ্টিকে ইংরেজিতে নিউ টেস্টামেন্ট বলা হয় আর প্রথম চারটিকে বলা হয় গসপেলস।

তেমনি নতুন নিয়মের পুস্তিকার সমষ্টিকে আরবীতে বলা হয় আলআহ্‌দুল জাদীদ আর প্রথম চারটিকে বলা হয় আনাজিল।

Scanned by CamScanner

নতুন নিয়মের পুস্তিকার সমষ্টিকে উদূর্তে বলা হয় আহাদ নামায়ে জাদীদ আর প্রথম চারটিকে বলা হয় আনাজিল। তবে বর্তমান বাংলাদেশের কিছু কিছু খ্রিস্টান সংগঠন নিউ টেস্টামেন্ট ও আলআহ্‌দুল জাদীদকে বাংলায় ইঞ্জিল শরীফ নামে প্রচার করছে এবং ২৭টি পুস্তিকার প্রত্যেকটি ইঞ্জিল শরীফের একেকটি খণ্ড বা সিপারা নাম দিয়েছে।[১] যেমন, প্রথম সিপারা : মথি, দ্বিতীয় সিপারা : মার্ক, পঞ্চম সিপারা : প্রেরিত, ২৭তম সিপারা : প্রকাশিত কালাম, প্রথম খণ্ড : মথি, দ্বিতীয় খণ্ড : মার্ক ইত্যাদি। কিন্তু আরবী ও উর্দূ ভাষায় ইঞ্জিল বলে নতুন নিয়মের শুধু প্রথম চারটি কিতাবকেই বুঝানো হয়। আর ইংরেজিতেও ইঞ্জিল শব্দের সমার্থবোধক শব্দ গসপেল বলে নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম চারটি কিতাবকেই বুঝানো হয়। তাহলে বাংলায় ইঞ্জিল শরীফের কেন এই অপব্যবহার? এ ধোঁকা বৈ কিছুই নয়, আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত আসমানি কিতাব ইঞ্জিলের প্রতি মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধকে কাজে লাগিয়ে ধোঁকা দেওয়ার পাঁয়তারা!

'তফসিরুল ইঞ্জিল'ও এই ধোঁকারই একটি অংশ। মূলত এসবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবরচিত ও বিকৃত 'নতুন নিয়ম'কে 'ইঞ্জিল শরীফ' এবং 'নতুন নিয়মে'র ব্যাখ্যাগ্রন্থকে 'তফসিরুল ইঞ্জিল' বলে সরলমনা মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়া এবং আসমানি কিতাব ইঞ্জিল সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের ফায়েদা ওঠানো। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

। চার।

ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের আলোকে আমরা বলতে পারি, মূল ইঞ্জিল এবং বিকৃতি ও নতুন করে রচনার ভিত্তিতে ইঞ্জিলের চারটি রূপ দাঁড়ায়। যথা :

এক. আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত প্রকৃত ইঞ্জিল।

দুই. নাযিলকৃত ইঞ্জিলের বিকৃতরূপ। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, বিকৃত অংশ আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের অংশ নয়।

তিন. মানব-রচিত ইঞ্জিল। ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর অজ্ঞাত কারো লিখিত ঈসা আলাইহিস সালামের কয়েকটি জীবনী। যেগুলোকে খ্রিস্টমণ্ডলী ঐশী অনুপ্রেরণায় লিখিত বিশ্বাস করে ঐশী প্রত্যাদেশ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

চার. মানব-রচিত ইঞ্জিলের বিকৃতরূপ। (খ্রিস্টানদের ভাষায় অজ্ঞাত লেখকদের লিখিত ইঞ্জিলের সম্পাদিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিতরূপ) যা বর্তমানে 'ইঞ্জিল শরীফ' কিংবা নতুন নিয়ম নামে পরিচিত।

ইঞ্জিলের এ চারটি রূপের প্রথমটি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত প্রকৃত ইঞ্জিলের প্রতিই মুসলমানগণ ঈমান রাখেন। তারা বিশ্বাস করেন, এ ইঞ্জিলই আল্লাহ তাআলার কালাম, যা তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিল করেছেন। এতে হেদায়েত ও নূর ছিল এবং এই ইঞ্জিলের শরীয়ত বনী ইসরাঈলের জন্য প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত এই প্রকৃত ইঞ্জিল খ্রিস্টানগণ হারিয়ে ফেলেছেন। আর বাকি তিন রূপের সবগুলোই মানবীয় হস্তক্ষেপের ফসল। তাই সেগুলো ভ্রান্ত ও আল্লাহ তাআলার কালাম হওয়ার অযোগ্য।

মোটকথা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের ইঞ্জিলও খ্রিস্টানদের কাছে নেই। আজকাল আমরা বাইবেল ও ইঞ্জিল নামে যেসব পুস্তক দেখতে পাই তা হচ্ছে ইঞ্জিলের চার রূপের চতুর্থ রূপ অর্থাৎ মানবরচিত ইঞ্জিলের বিকৃতরূপ (খ্রিস্টানদের পরিভাষায় অজ্ঞাত লেখকদের লিখিত ইঞ্জিলের সম্পাদিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত রূপ)।

আরেকটি কথা বলা মুনাসিব মনে করছি, তা হচ্ছে– যদি ইঞ্জিলের তৃতীয় রূপ অর্থাৎ মানবরচিত ইঞ্জিল (অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনী) আজও খ্রিস্টানদের কাছে অবিকৃত অবস্থায় থাকত আর নিশ্চিতভাবে জানা যেত যে এর লেখক কে বা কারা, লেখকদের নির্ভরযোগ্য হওয়ার বিষয়টিও যদি গ্রহণযোগ্য সূত্রে জানা যেত এবং লেখক থেকে কোনো 'মুত্তাসিল সনদ' বা অবিচ্ছিন্ন-সূত্র খ্রিস্টানদের কাছে বিদ্যমান থাকত, তবে আর কিছু না হোক এর মাধ্যমে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রামাণ্যজীবনী জানা যেত। এর কাছাকাছি একটি উদাহরণ হচ্ছে বার্নাবাসের ইঞ্জিল। বার্নাবাসের ইঞ্জিলকে যদিও ওহী বা ঐশী গ্রন্থ বলা সম্ভব নয়, তবে এটুকু তো বলা যেতেই পারে যে, বার্নাবাসের ইঞ্জিল হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালামের অপেক্ষাকৃত ভালো জীবনীগ্রন্থ।

। পাঁচ।

প্রচলিত ইঞ্জিল সম্পর্কে খ্রিস্টানগণ বড় আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার। তারা অনেক সময় প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তরে বলেন থাকেন, ঈসা আলাইহিস সালামই হলেন ইঞ্জিল অর্থাৎ সুখবর বা সুসংবাদ। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোনো কিতাব নয়, বরং ইঞ্জিল হল ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী বা শিক্ষা, যা 'ইঞ্জিল' কিতাবে পাওয়া যায়। খ্রিস্টানদেরকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, ইঞ্জিল কিতাব চারটি কেন? হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল তো ছিল একটি কিতাব, চার ইঞ্জিল কোত্থেকে এল? এসব প্রশ্নের উত্তরে তাদের আত্মপ্রবঞ্চিত উত্তর হচ্ছে–

'এটা আল্লাহর নাযিলকৃত ইঞ্জিল ঠিকই, কিন্তু তা ঈসার জীবনকালে একটি বই ছিল না; বরং তা ছিল একটি বাণী বা শিক্ষা। সেই শিক্ষা 'ইঞ্জিল' কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায়। ...অন্যান্য নবী লিখিত বাণী (আল্লাহর কালাম) নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু হযরত ঈসার ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি নিজেই আল্লাহর জীবন্ত বাণী ছিলেন এবং এ জন্য তাঁর কিতাব (ইঞ্জিল) অপ্রধান, বরং হযরত ঈসাই প্রধান বাণী। ইঞ্জিল কিতাব হচ্ছে আল্লাহর জীবন্ত বাণীর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে পাক-রূহের পরিচালনায় লিখিত সাক্ষীদের পবিত্র লিখিত বর্ণনা...।'

প্রচলিত 'তফসিরুল ইঞ্জিলে'র ভূমিকার একটি বাক্য আরো বিস্ময়কর। তাতে লেখা হয়েছে, 'প্রাথমিক যুগের ঈসায়ীরা পুরাতন নিয়মকেই তাদের পাক-কিতাব বলে গ্রহণ করেছিল। কারণ তখনও ইঞ্জিল শরীফ কিতাব আকারে লেখা হয়নি।'

তাহলে তো বলতে হবে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছেও ইঞ্জিল কিতাব ছিল না?

এসব আত্মপ্রবঞ্চনার উত্তরের জন্য ঈসা আলাইহিস সালামের একটি কথাই যথেষ্ট। ঈসা আলাইহিস সালামের মুখের কথা কুরআনে এসেছে এভাবে–

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا.

'সে (শিশু ঈসা) বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।' –সূরা মারইয়াম (১৯) : ৩০

। ছয়।

প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তরে খ্রিস্টানগণ যদিও এ কথাই বলেন যে, 'ঈসা আলাইহিস সালাম ইঞ্জিল লাভ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা ঈসার জীবনকালে একটি বই ছিল না,

(বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়)

১. নতুন নিয়মের প্রথম চারটিও কিন্তু কুরআনে বর্ণিত ইঞ্জিল নয়। বলার উদ্দেশ্য হল অন্যান্য দেশে 'ইঞ্জিল' নামের অপব্যবহার করা হয়েছে কম আর এ দেশে করা হয়েছে পূর্ণ মাত্রায়।

Scanned by CamScanner

পরিবারের সবার জন্য দ্বীনশিক্ষা

আসুন! দ্বীন শিখি দ্বীন শেখাই

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

অনেকেই সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানোর আগ্রহ পোষণ করেন। আলেম বানানোর স্বপ্ন লালন করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, দিনমজুর সম্ভবত কোনো শ্রেণিই বাদ নেই। এমন লোকও দেখেছি, যার একটিমাত্র ছেলে এবং কষ্টেসৃষ্টে তার জীবন কাটে। তারপরও ছেলেকে মাদরাসায় পড়াচ্ছেন। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছেন।

একজন মুসলিমের এমনটিই হওয়া উচিত। সন্তানকে দ্বীনী মাদরাসায় পড়ানো, আলেম বানানো মুমিনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নগুলোর অন্যতম। এ স্বপ্ন সবার হৃদয়ে উদিত হোক। মাদরাসার উদ্যান ইলম পিপাসীদের পদচারণায় মুখরিত হোক।

ইতিবাচক নানাদিকের পাশাপাশি একজন নগণ্য তালিবে ইলম হিসেবে বিভিন্ন তালিবে ইলম, তাদের অভিভাবক, পরিবার-পরিজনের সাথে কথা বলে, বিভিন্ন অবস্থা দেখে কিছু শূন্যতাও অনুভূত হয়েছে নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে। ইচ্ছে হচ্ছে, এখানে এ বিষয়ে কিছু মুযাকারা করি। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিন।

কোনো কোনো পরিবারে কয়েক সন্তানের মধ্যে এক সন্তানকে মাদরাসায় পড়ানো হয়। পড়ানো তো দরকার সবাইকেই, কিন্তু কোনো কারণে তা সম্ভব না হলে করণীয় হচ্ছে, প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষা সবাইকে দেওয়া। এটা মুসলিম মাত্রেরই জরুরি। সে যে পেশাই অবলম্বন করুক। যেমন ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, কুরআন তিলাওয়াত, অযু, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্বের প্রয়োজনীয় মাসায়েল, হালাল-হারামের বুনিয়াদী বিষয়সমূহ, ইসলামী আদব-আখলাক, দ্বীনের বোধ ও চেতনা, দ্বীনের প্রতি দরদ ও মহব্বত প্রভৃতি বিষয়।

এ শিক্ষা এজন্য জরুরি যে, এতে সে ধীরে ধীরে দ্বীনমনস্ক ও ইসলামীবোধসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারবে। ঈমান ও তাকওয়ার চেতনায় উজ্জীবিত হবে। জীবনাচরণে ন্যায় ও সততার পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। দায়িত্ববান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। এই শিক্ষা সাধারণ শিক্ষায় শক্তি সঞ্চার করবে, আলো ছড়াবে। এর সুফল বয়ে আনতে সহায়তা করবে।

প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম ও বোধ সবসময় জরুরি। বর্তমানে অনেক বেশি জরুরি। এখন বিপথগামিতার উপায়-উপকরণ ও হাতছানি অতীতের চেয়ে বেশি। ওসব উপকরণ এখন বাইরের জগৎ পেরিয়ে চার দেয়ালের ভেতরেও ঢুকে পড়েছে। এজন্য অনেকেই পরামর্শ দিচ্ছেন অভিভাবকগণ যেন সন্তানদের চোখের উপর রাখেন। আসলে চোখের উপর কতক্ষণ রাখবেন। এটা তাদের বিরক্তিরও কারণ হতে পারে। তাই গোড়া থেকে পরিশীলিত করতে হবে। অন্তরে ঈমান ও তাকওয়া বপন করতে হবে। আর এটা সম্ভব কেবল দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমেই।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এটি বাস্তব উদাহরণ এবং তা অনেকেরই জানা। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. জনগণের খোঁজ-খবর রাখতেন। কে কী করে, কার কী সমস্যা পর্যবেক্ষণ করতেন। একবার রাতের বেলায় সে উদ্দেশ্যে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তি এসে গেল। তখন মধ্যরাত। একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে দুধে পানি মিশাতে বলছে। মেয়েটি মাকে বলল, আপনি কি শুনেননি, খলীফা আজ কী আদেশ জারি করেছেন? তিনি ঘোষণা করিয়েছেন, কেউ যেন দুধে পানি না মেশায়। বৃদ্ধা বলল, এখন মেশালে না খলীফা দেখবেন, না তার ঘোষণাকারী। মেয়েটি বলল, তারা না দেখলেও আল্লাহ তো দেখবেন। আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, মানুষের সামনে আল্লাহর আনুগত্য করব আর নির্জনে নাফরমানি করব।

কত গভীর বোধ ও উপলব্ধি! কী জ্বলন্ত চেতনা ও বিশ্বাস!! নির্জনেও অনৈতিকতাকে অকপটে প্রত্যাখ্যান। এটাই হচ্ছে সত্যিকার ঈমান ও তাকওয়ার ফল, যা অনন্য, অতুলনীয়।

এই শিক্ষা পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক। এর আওতায় সকল সন্তানকে নিয়ে আসা চাই এবং তা আগে থেকে শুরু করা উত্তম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এ ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার উপর নির্ভর করে একটি শিশুর ভবিষ্যৎ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার ভিত্তি শক্ত না হলে পরবর্তীতে তা শোধরানো কঠিন। শৈশবের শিক্ষা পাথরে অঙ্কিত নকশার মতই অন্তরে গেঁথে যায় এবং জীবনাচরণে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে।

এ শিক্ষার জন্য প্রভাতী মকতব বা স্কুলের ধর্ম শিক্ষা যথেষ্ট নয়; মকতবে তো একেবারে প্রাথমিক কিছু বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। আর স্কুলের ধর্ম শিক্ষা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে হয়ত কিছু তথ্য ও জ্ঞান অর্জিত হবে, কিন্তু দ্বীনের বোধ ও চেতনা, জযবা ও প্রেরণা জাগ্রত হওয়া কঠিন। তাই এগুলোর পাশাপাশি বয়স অনুপাতে আরো উদ্যোগ-ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সাথে দরকার পিতা-মাতার সন্তানদের নিয়ে এসব বিষয়ে মুযাকারা করা।

কিন্তু আমাদের পরিবারগুলোতে দ্বীনী বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার অনেক অভাব। প্রতিটি পরিবারে দ্বীনী আলোচনার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। এ ক্ষেত্রে 'তালীম' একটি উপলক্ষ বা সহায়ক হতে পারে। প্রতিদিন সুবিধামত সময়ে দ্বীনী কোনো কিতাব থেকে তালীম হবে, যেখানে পরিবারের সকল সদস্য উপস্থিত থাকবেন। একজন পাঠ করবেন, বাকিরা শুনবেন। এটা ঘরের মধ্যে, পরিবারের লোকদের মাঝে দ্বীনী আবহ বিস্তারে সহায়ক হবে।

ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহর কাছে নেক সন্তান প্রার্থনা করতে বলে। আদি পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যান; কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান জন্মায়নি। জীবনসন্ধ্যায় দাঁড়িয়েও তিনি সন্তানের অভাব বোধ করেছেন। দুআ-কাতর হয়েছেন মহান আল্লাহর দুয়ারে। হযরত ইবরাহীম আলাই-

Scanned by CamScanner

হিস সালাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন– নেক সন্তান। কুরআনের ভাষায়–

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে প্রভু! আমাকে নেক সন্তান দান করুন। –সূরা সাফফাত (৩৭) : ১০০

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামেরও চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান জন্মায়নি। জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে তিনি দয়াময় আল্লাহর দরবারে সন্তান প্রার্থনা করেছেন। তবে যেনতেন সন্তান নয়। কাতর-মিনতি করেছেন সেই সন্তান যেন দুটি গুণে গুণান্বিত হয়। ১. আমার ও ইয়াকুব আলাইহিস সালামের (ইলমের) ওয়ারিশ হবে। ২. সেই সন্তান যেন আপনার সন্তুষ্টিধন্য হয়। কুরআনের ভাষায়–

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতায় উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করে কখনও ব্যর্থকাম হইনি। আমি আমার পর আমার চাচাত ভাইদের ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি আপনার নিকট থেকে আমাকে এমন এক উত্তারাধিকারী দান করুন– যে আমারও উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তরাধিকারও লাভ করবে এবং হে আমার প্রতিপালক! তাকে এমন বানান, যে (আপনার নিজেরও) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। –সূরা মারইয়াম (১৯) : ৪-৬

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানেও একই কথা উচ্চারিত হয়েছে। তিনিও নেক সন্তানকেই মুমিন-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন– 'মৃত্যুর পর তিনটি আমল ছাড়া সব আমলের যোগাযোগ রহিত হয়ে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়া ২. উপকারী ইলম ৩. নেক সন্তান।' –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩১০

এই মহান নবীগণ শুধু নেক সন্তানের কথা বলেছেন কেন? কারণ নেক সন্তানই মা-বাবা ও জাতির ভবিষ্যৎ। শিশুর ভবিষ্যৎ আর জাতির ভবিষ্যৎ একই সুতোয় গাঁথা। নেক সন্তান পরিবার, সমাজ, দেশ সবার জন্য গৌরব ও কল্যাণকর। আর অসৎ সন্তান সবার জন্য কলঙ্ক ও ক্ষতিকর। তাই তাঁরা আল্লাহর কাছে নেক সন্তানের জন্য মুনাজাত-কাতর হয়েছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁদের চেষ্টারও কোনো কমতি ছিল না। সুতরাং ছেলেমেয়েকে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে নেক, সৎ ও যোগ্য মানুষরূপে গড়ে তুলতে পিতা-মাতার সচেষ্ট হতে হবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে সমাজে যথেষ্ট শূন্যতা বিরাজমান। যে সন্তানকে দ্বীনী মাদরাসায় পড়ানো হয় তো হয়ই আর যাকে পড়ানো হয় না তাকে অনেক সময় প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষা পর্যন্ত দেওয়া হয় না। অথচ দ্বীনী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, পরিবারের যে ব্যক্তি আলেম তিনি পরিবারের অন্য লোকদের দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে আন্তরিক নন এবং তাদেরও তার কাছ থেকে শেখার আগ্রহ নেই। আলেম হওয়ার আগে পরিবারের যে দ্বীনী অবস্থা ছিল আলেম হওয়ার পরও সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আগে যে তিমিরে নিমজ্জিত ছিল এখনো সেখানেই পড়ে রয়েছে। যার পরিণতি হয় অনেকটা 'বাতির নিচে অন্ধকার' এ প্রবচনটির মত। অথচ নিজের কল্যাণের পর আলেম হওয়া বা বানানোর প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরিবারের কল্যাণ। ইলম দ্বারা প্রথমত উপকৃত হবেন আলেম নিজেই। ইলম অনুযায়ী আমল করে নিজ জীবনকে জ্যোতির্ময় করবেন। দ্বিতীয়ত উপকৃত হবে তার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন। তিনি তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিবেন। তারাও তার কাছ থেকে শিক্ষা করবে। তার আলো থেকে আলো নিয়ে নিজেদের জীবন আলোকিত করবে। এ রকম সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একজন আলেমের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট পরিবার নির্মিত হতে পারে। পবিত্র কুরআনের ইরশাদ–

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

তাদের প্রতিটি (বড়) দল থেকে একটি (ছোট) অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীনের বুঝ অর্জন করতে পারে এবং তাদের কওমকে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে। ফলে তারা সতর্ক হবে। –সূরা তাওবা (৯) : ১২২

এখানে যিনি দ্বীনের বুঝ অর্জন করেছেন তাকে বলা হয়েছে, তিনি যেন নিজ কওমকে তা শিক্ষা দেন। আর কওমকে বলা হয়েছে তারা যেন সে অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করেন। আর কওমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তো পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনই।

আসলে আলেমের দায়িত্ব এখানেই শেষ নয়; পরিবার ও সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে দেশব্যাপী তাঁর দায়িত্ব। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আদর্শ সমাজ ও দেশ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আলেম হলেন কুরআন-সুন্নাহর ধারক ও বাহক। দ্বীনের দাঈ ও প্রহরী; যিনি নিজে কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করবেন। তা অপরাপর মানুষের মাঝেও ছড়িয়ে দিবেন। মানুষকে ন্যায়, শান্তি ও কল্যাণের দিকে ডাকবেন। অন্যায়, অকল্যাণ ও অনৈতিকতা থেকে নিষেধ করবেন। অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করে মানুষের সামনে এর প্রায়োগিক রূপও তুলে ধরবেন। মানুষের আমল সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তাও পর্যবেক্ষণ করবেন।

এসকল বৈশিষ্ট্যের কারণেই হাদীসে তাদেরকে নবীগণের ওয়ারিশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে– 'আলউলামা-উ ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া।' নবীজীর এই ইরশাদ থেকে তাদের দায়িত্বের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা যেমন অনুমান করা যায়, তেমনি অনুভব করা যায় মানবজীবনে তাদের কী প্রয়োজন।

আমরা সবাই অনুভব করি, একজন ডাক্তারের কী প্রয়োজন। মানুষের জন্য আলেমের প্রয়োজনীয়তা ডাক্তারের মতই। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেমন ডাক্তার দরকার, তেমনি আত্মিক, চারিত্রিক ও নৈতিক সুস্থতা ও উন্নতির জন্যও আলেম দরকার। ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর নাম হয়ত অনেকেই শুনেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর একটি চমৎকার উপদেশ আছে। তিনি বলেছেন, যে শহরে দ্বীনী সমস্যার সমাধানের জন্য আলেম নেই এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার সমাধানের জন্য ডাক্তার নেই, সেখানে বসবাস করো না।

তো তাঁর দৃষ্টিতে ডাক্তার ও আলেমের প্রয়োজনীয়তা সমান। ডাক্তার ও আলেম না থাকলে মানুষ সর্বাঙ্গীণ সুস্থ জীবন যাপন করবে কীভাবে?

ইমাম সুফিয়ান সাওরী রাহ. তো স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, আলেমগণ হলেন

Scanned by CamScanner

ডাক্তার। যারা মানুষের (আত্মিক) রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করবেন এবং এর সঠিক ঔষধ বলে দিবেন।

এই উক্তিতে আলেমের প্রয়োজনীয়তার দিকটি মূর্ত হওয়ার পাশাপাশি আরেকটি সত্যের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। তা হল আলেমের কাছে যেতে হবে। সাধারণত ডাক্তার রোগীর কাছে আসেন না; রোগীই তার কাছে যায়। যদিও ইসলামে আলেমের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি নিজে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে যাবেন। তাদের দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবেন। যার শুরুতেই রয়েছে তার পরিবার-পরিজন। সেই সাথে পরিবারের লোকদেরও কর্তব্য তার কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা করা।

এক্ষেত্রে লজ্জা-শরম বাধা হওয়া মোটেই উচিত নয়। শিক্ষার ব্যাপারে লজ্জার কিছু নেই। ছোট বড়র কাছ থেকে শিক্ষা করবে। বড়ও প্রয়োজনে ছোটর কাছ থেকে জানবেন। ছেলেমেয়েরা মা-বাবার কাছ থেকে শিখবে। মা-বাবাও প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে জানবেন। ভাই-বোনেরা একে অপরের কাছ থেকে শিক্ষা করবে। ইসলামী ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় হচ্ছে উস্তায শাগরেদের কাছ থেকে এবং পিতা-মাতা সন্তানের কাছ থেকে অজানা বিষয় জেনে নিতেন। এক্ষেত্রে তারা মোটেই সংকোচ বোধ করতেন না।

ইলম শিক্ষার জন্য আমাদের পূর্বসূরিগণ কত দূরদূরান্ত সফর করেছেন। কত দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন। ছোট-বড় নানা বিষয়ের জন্যই তা হয়েছে। এটি আমাদের ইতিহাসের আরেকটি প্রোজ্জ্বল দিক। একটি উদাহরণ দেখুন– আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ.-এর নাম হয়ত অনেকেই শুনেছেন। তিনি হাদীস, ফিকহ, যুহদ, তাকওয়া সর্বক্ষেত্রে শীর্ষব্যক্তিত্ব ছিলেন। হাসান বসরী রাহ.-এর একটি নসীহত শোনার জন্য তিনি 'মারব' থেকে 'রায়' অঞ্চলে সফর করেছেন। 'মারব' থেকে 'রায়ে'র দূরত্ব এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। সেখানে গিয়ে হারূন ইবনে মুগীরার সাথে সাক্ষাৎ করেন। হারূন ইবনে মুগীরা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক সওয়ারির উপর আরোহণ করে আমার কাছে এলেন এবং হাসান বসরী রাহ.-এর একটি নসীহত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমি ইসমাঈল ইবনে মুসলিম থেকে শুনেছি, তিনি হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেছেন, 'একজনকে শত্রু বানিয়ে হাজার মানুষকে খুশি করো না।' আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, আমি তো এটার জন্যই এসেছি।

লক্ষ করুন, এটি দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় নয়; একটি নসীহতমাত্র। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির এই যামানায়ও এক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া সহজ নয়। আজ থেকে এগারো-বারো শ বছর আগে ঘোড়া, গাধা ও উটের যামানায় তা কত কষ্টের ছিল, সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই কঠিন কাজটিই তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল, যার মূলে ছিল দ্বীন-তৃষ্ণা।

এই গৌরবময় ধারা মিটিমিটি হলেও এখনো কতক জায়গায় জ্বলছে। তাই আমাদের দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে। আর যখন নিজেরাই পরিবারের একজনকে সাগ্রহে মাদরাসায় পাঠিয়েছেন, আলেম বানিয়েছেন, তো তার কাছ থেকে শেখার উৎসাহ থাকবেনা কেন? আর তারই বা কেন থাকবে না নিজের প্রিয়জনদের শেখানোর আগ্রহ?

দারুল আরকাম

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০), গ্রাউন্ড ফ্লোর
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। ০১৯৭৭ ৬৪৮১৮৫

মনীষীদের কাছে সময়ের মূল্য

মূল : শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.

এই বইটি বিখ্যাত 'কিমাতুয যামান ইনদাল উলামা'-এর সর্বশেষ সংস্করণের অনুবাদ। যাতে সময়ের গুরুত্ব ও পূর্বেকার উলামাদের সময়সচেতনতা ও জ্ঞানান্বেষণের পেছনে তাঁদের দীর্ঘ পরিশ্রম, সবর ও যুহদ বিষয়ক প্রামাণ্য আলোচনা রয়েছে। সময় সচেতনতার সেইসব পাঠ বইটিতে আছে- যা বিশ্ব ইতিহাসকে করে রেখেছে অলংকৃত, বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত ...

পৃষ্ঠা : ৩৩৬ । মূল্য : ৩৬০/=

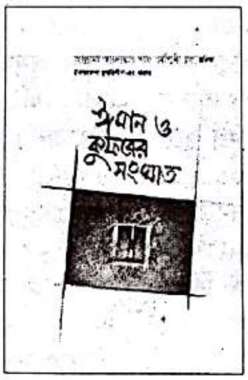

ঈমান ও কুফরের সংঘাত

মূল : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.

গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন ও ভূমিকা লিখেছেন- মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মুফতী কেফায়াতুল্লাহ, মাওলানা আযিযুর রহমান দেওবন্দী, মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানী, মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী রহ. সহ বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দ।

পৃষ্ঠা : ৩৫২ । মূল্য : ৩২০/=

পড়ালেখার কলাকৌশল
মূল্য : ১৮০

পুত্রের প্রতি পিতার পত্র
মূল্য : ২৪০

খাদীজা : জীবন ও সংসার
মূল্য : ৩৪০

আসহাবে কাহাফ
মূল্য : ২০০

ছোটদের প্রতি উপদেশ
মূল্য : ৮০

হোসাইনী আদর্শ
মূল্য : ১২০

ভার্সিটির ক্যান্টিনে
মূল্য : ১৩০

হে যুবক
মূল্য : ১৬০

প্রকাশের পথে...
- সিরিয়ার কারাগারে রুদ্ধশ্বাস ৯ বছর
- বিশ্ববিশ্রুত সাহাবী বিলাল হাবশী রা.
- কমান্ডার অব মুসলিম আর্মিজ [সিরিজ ১-১০]
- শুহাদা [সিরিজ ১-৪] ▪ মুঘল [সিরিজ ১-২]
- দাজ্জাল : কে, কবে, কোথায়?

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই
- নারী : নানা ধর্মে, কল্পনা ও বাস্তবতায়
- যুবকদের প্রতি সীরাতের আহ্বান
- পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
- ফাতিমাতুয্ যাহরা : জীবন ও অবদান
- আঁধার চিরে আলোর পথে
- হে আমার ছেলে
- হে আমার মেয়ে
- ইউথস প্রবলেম

Scanned by CamScanner

প্রচলিত ভুল

মূসা আ. ও আল্লাহর মাঝে কথোপকথন

আল্লাহ! আসমান-যমীন-সূর্য এত বড় বড় সৃষ্টি আপনার নাফরমানী করলে কী করবেন?

মূসা আলাইহিস সালাম হলেন, কালীমুল্লাহ–যাঁর সাথে আল্লাহ দুনিয়াতে কথা বলেছেন। মূসা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহর মাঝে কথোপকথন কুরআনে বর্ণিত এক বাস্তব সত্য। কিন্তু একে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে বিভিন্ন অবাস্তব অলীক কাহিনী প্রসিদ্ধ হয়েছে। তেমনি এক কাহিনী–

একবার মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন, আল্লাহ! আপনার এত বড় বড় সৃষ্টি– আসমান-যমীন, চাঁদ-সূর্য ইত্যাদি এগুলো যদি আপনার নাফরমানী করে আপনি কী করবেন? আল্লাহ বললেন, হে মূসা! এগুলো কখনোই আমার নাফরমানী করবে না। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, যদি করে। এভাবে তিন বার বলার পর তৃতীয়বার আল্লাহ বললেন, যদি এগুলো আমার নাফরমানী করে তো আমার সৃষ্ট এক প্রাণী আছে, তাকে হুকুম করব, সে এক লোকমায় সব খেয়ে ফেলবে।

মূসা বললেন, সে প্রাণী কোথায় আছে? আল্লাহ বললেন, একটি ময়দানে তা চরে বেড়াচ্ছে। মূসা বললেন, সে ময়দান কোথায়? আল্লাহ বললেন, আমার ইলমে আছে।

এটি একটি অলীক কিচ্ছা। এর কোনোই ভিত্তি নেই। এ ধরনের কিচ্ছা বিশ্বাস করা ও বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

আল্লাহর কুদরতের কথা বলতে গিয়ে কিছু অসচেতন মানুষকে এগুলো অবলীলায় বলতে শোনা যায়। অথচ এর কোনোই ভিত্তি নেই। শুধু শোনার ভিত্তিতে বলে যাওয়া। আল্লাহর কুদরত তুলে ধরার জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলির কি কোনো অভাব রয়েছে? খোদ মানুষই তো আল্লাহর কুদরত ও নিদর্শনাবলির এক মহাসমুদ্র। হাজার বছর ধরে গবেষণা করে গেলেও আল্লাহর এই এক সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কুদরতের যত নিদর্শন আছে– শেষ হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে কারীমে আল্লাহ বলেছেন–

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে আছে বহু নিদর্শন এবং স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেও! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করতে পার না? –সূরা যারিয়াত (৫১) : ২০-২১

সুতরাং আমরা আল্লাহর কুদরতের আলোচনা করতে গিয়ে এ ধরনের অলীক কাহিনী বলা থেকে বিরত থাকব।

একটি ভুল ধারণা

ওলী-বুযুর্গদের কবরকে কি কবর বলা যাবে না, মাযার বলতে হবে?

কিছু মানুষের ধারণা, ওলী-বুযুর্গগণের কবরকে কবর বলা যাবে না; মাযার বলতে হবে। কবর বললে নাকি তাঁদের সাথে বেয়াদবি হবে। এটি একটি অমূলক কথা। কবর শব্দের অর্থ দাফনস্থল অর্থাৎ যে স্থানে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয়। আর মাযার শব্দের অর্থ দুটি : যিয়ারত করা এবং যিয়ারত স্থল। তাই যে কোনো মুসলমানের দাফনস্থলকে যেমন কবর বলা যায় তেমনি যে কোনো মুসলমানের কবরকে আভিধানিক অর্থে মাযারও বলা যায়। কেননা, সকল মুসলমানের কবরই কমবেশি যিয়ারত করা হয়। বুযুর্গ, নেককার ও ওলীদের দাফনস্থলকে কবর বলা যাবে না– এমন কোনো বিধান শরীয়তে নেই।

হাদীসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবীগণের দাফনস্থলকেও কবর বলা হয়েছে। এমনকি হাদীসে নবী-রাসূলগণের কবরকেও কবর শব্দেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنصَارَى، اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

ইহুদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহর লা'নত, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থান বানিয়েছে। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৩৫

এই হাদীসে নবীদের দাফনস্থলকে কবর বলা হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের ব্যাপারেই বলেন–

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا

আমার কবরকে তোমরা উৎসবের স্থান বানিও না। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২০৪২

সুতরাং বোঝা গেল, যত সম্মানিত ব্যক্তিই হোক তার দাফনস্থলকে কবর বলা দোষণীয় নয়। তাই ওলি-বুযুর্গগণের দাফনস্থলকেও কবর বলা যাবে। এতে বেয়াদবির কিছু নেই; বেয়াদবি তো তাঁদের শিক্ষার বিপরীতে তাঁদের কবরে সিজদা করা, ওরছ করা, মান্নত করা ইত্যাদি।

বলার ভুল

আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা

সুবহানাল্লাহ– আল্লাহ তাআলার তাসবীহ বা পবিত্রতাজ্ঞাপক বাক্য। এ তাসবীহটি আলেম-সাধারণ সকলেরই জানা। সাথে সাথে এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা জনসাধারণ আলেমদের মুখে শুনে থাকেন– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কিন্তু বিষয়টি সবাই বোঝেন না। ফলে কেউ কেউ মনে করেন, সুবহানাল্লাহ বাক্যটিই এখানে বলা হচ্ছে। আর এ ধারণা থেকেই তারা 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'-এর স্থলে 'আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা' বলে থাকেন। এভাবে বলা ভুল। সঠিক হল, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'।

সুবহানাল্লাহ বাক্যে 'সুবহানা'-এর সাথে সরাসরি 'আল্লাহ' এই মহান শব্দ ব্যবহৃত হয়ে (সুবহানা+আল্লাহ–এই মহান শব্দ) সুবহানাল্লাহ গঠিত হয়েছে। আর 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা' এ বাক্যের 'সুবহান-হু' শব্দে 'সুবাহানা'-এর সাথে সর্বনাম 'হু' ব্যবহৃত হয়ে (সুবহানা+হু) 'সুবহানাহু' হয়েছে। কারণ, এই বাক্যের শুরুতে 'আল্লাহ'–এই মহান শব্দ এসেছে। ফলে পরবর্তীতে সর্বনাম 'হু' ব্যবহার করা হয়েছে। আর তাই 'সুবহানাল্লাহ'-এর পরিবর্তে 'সুবহানাহু' হয়েছে। তাই 'আল্লাহ সুবহানাল্লাহি তাআলা' না বলে 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা' বলতে হয়।

'আল্লাহ'–এই মহান শব্দ উচ্চারণের পর আমরা অনেক সময়ই আল্লাহর বড়ত্ব বা পবিত্রতাজ্ঞাপক বাক্য বলে থাকি। যেমন, আল্লাহ তাআলা বা আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইত্যাদি। এখানে 'তাআলা' ও 'জাল্লা শানুহু' আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশক বাক্য। এরকমই আল্লাহর পবিত্রতা ও বড়ত্ব প্রকাশক বাক্য হল, 'সুবহানাহু ওয়া তাআলা', যা আমরা অনেক সময়ই 'আল্লাহ'–এই মহান শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে বলে থাকি। ●

Scanned by CamScanner

আপনি যা জানতে চেয়েছেন

ফতোয়া বিভাগ : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

তাহারাত-পবিত্রতা

হাফসা আক্তার
রামপুরা, ঢাকা

৪২৮৩ প্রশ্ন : কাঁথা-কম্বল ইত্যাদির কোনো এক কোণে যদি ছোট বাচ্চার পেশাব লাগে এবং তা শুকিয়ে যায় তাহলে কি অপর পাক অংশে নামায পড়া যাবে? তেমনি তোশক বা জাজিমের এক পিঠে নাপাকি লাগলে তা উল্টিয়ে অপর পিঠে কি নামায পড়া যাবে?

উত্তর : কাঁথা-কম্বলের এক অংশ নাপাক হলে এর পাক অংশে নামায পড়া জায়েয আছে। আর ভারী তোশক বা জাজিমের এক পিঠে নাপাকি লাগলে তার অপর পিঠে যদি নাপাকির রং বা আর্দ্রতা প্রকাশ না পায় এবং গন্ধও পাওয়া না যায় তাহলে অপর পিঠে নামায পড়া যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, জাজিম, তোশক ইত্যাদি যেগুলো ধোওয়া যায় না, সেগুলোতে নাপাকি লেগে গেলে নাপাকি শুকিয়ে যাওয়ার পর তার উপর জায়নামায বা কাপড় বিছিয়ে তা ব্যবহার করা যাবে এবং নামায পড়া যাবে। –হালবাতুল মুজাল্লী ১/৫৭১; আসসিআয়া ২/৫৯; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৬২; রদ্দুল মুহতার ১/৪০২

সালাত-নামায

আরিফুদ্দীন
খাগড়াছড়ি

৪২৮৪ প্রশ্ন : আমি ফজরের নামাযের পর বসে বসে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করছিলাম। সূর্যোদয়ের ১০ মিনিট পূর্বে একটি সিজদার আয়াত পাঠ করি। একটু পরে আমি সিজদাটি আদায় করি। তখন সূর্য উদয় হচ্ছিল। এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে, এ সময় আমার উক্ত সিজদা আদায় করা কি সহীহ হয়েছে?

উত্তর : তিলাওয়াতে সিজদাটি আদায় হয়নি। তা পুনরায় আদায় করতে হবে। কেননা সূর্যোদয়ের সময় সিজদা করা নিষেধ। –আলমুহীতুল বুরহানী ২/৩৬৩; বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৪১; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৯০; ফাতাওয়া খানিয়া ১/১৫৭

রফিকুল ইসলাম
জালালাবাদ, সিলেট

৪২৮৫ প্রশ্ন : আমি মসজিদে এসে ফজরের সুন্নত পড়ছিলাম। এমন সময় ইমাম সাহেব সিজদার আয়াত পাঠ করেন এবং সিজদাও আদায় করেন। সুন্নত শেষে আমি ঐ রাকাতের রুকুতে শরীক হয়ে যাই। জানার বিষয় হল, এ অবস্থায় নামায শেষে কি আমার উক্ত সিজদা আদায় করতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ইমাম যে রাকাতে সিজদা করেছেন আপনি যেহেতু সে রাকাতের রুকুতে শরীক হয়েছেন তাই উক্ত সিজদাটিও পেয়েছেন বলে ধর্তব্য হবে। পৃথকভাবে তা আদায় করতে হবে না। –খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৮৫; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৫০২; শরহুল মুনয়া পৃ. ৫০১; মারাকিল ফালাহ পৃ. ২৬৭; আলবাহরুর রায়েক ২/১২২

নাজিমুদ্দীন
সদর, কুমিল্লা

৪২৮৬ প্রশ্ন : ঈদের খুতবায় ইমামের তাকবীর বলার সময় মুসল্লীরাও কি তাকবীর বলবে না চুপ থাকবে? অনেককে তাকবীর বলতে দেখা যায়। সঠিক মাসআলাটি জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর : ঈদের খুতবা চলাকালীন উপস্থিত লোকদের জন্য সম্পূর্ণ চুপ থেকে খুতবা শোনা ওয়াজিব। তাই খুতবার সময় মুসল্লীগণ তাকবীর বলবে না; বরং চুপ থেকে খুতবা শুনবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

وَجَبَ الْإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالِاسْتِسْقَاءِ.

চারটি স্থানে চুপ থাকা ওয়াজিব ; জুমা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং ইসতিসকার খুতবার সময়। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৫৬৪২) –আলমাবসূত, সারাখসী ২/৩৭; আলবাহরুর রায়েক ২/১৬২; বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/১৫৯; রদ্দুল মুহতার ১/৫৪৫

খলিলুর রহমান
লাকসাম, কুমিল্লা

৪২৮৭ প্রশ্ন : আমি গত ঈদের ছুটি শেষে ঢাকার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে ৪/৫ মাইল দূরবর্তী স্টেশনে পৌছি এবং সেখানে যোহরের নামায কসর করি। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষ কারণে সফর বাতিল করে বাড়িতে এসে দেখি যোহরের ওয়াক্ত এখনো বেশ বাকি। এখন প্রশ্ন হল, আমাকে উক্ত যোহরের নামাযটি কি পুনরায় পূর্ণ ৪ রাকাত পড়তে হবে?

উত্তর : না, ঐ নামাযটি পুনরায় আদায় করতে হবে না। তা সহীহভাবে আদায় হয়েছে। কেননা আপনি যখন নামায পড়েছেন তখন আপনি মুসাফির ছিলেন। পরবর্তীতে সফর বাতিল করলেও ঐ নামায বাতিল হয়নি। –বাদায়েউস সানায়ে ১/২৭২; ফাতাওয়া সিরাজিয়া পৃ. ১২; শরহুল মুনয়া পৃ. ৫৪২; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৫২৯

রেজাউল করিম
পেকুয়া, কক্সবাজার

৪২৮৮ প্রশ্ন : কখনো কখনো শেষ রাতে তাহাজ্জুদ শেষ করার পর দেখি, কিছু আগে সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। প্রশ্ন হল, আমার এ নামায কি নফল হিসেবে গণ্য হবে? নফল হলে যেহেতু ফজরের সময় হওয়ার পর শেষ হয়েছে এ জন্য তা মাকরূহ হবে কি না?

উত্তর : সুবহে সাদিকের পূর্বে নফল শুরু করার পর নামায শেষ করার আগেই যদি সুবহে সাদিক হয়ে যায় তাহলেও তা বাতিল হবে না এবং তা মাকরূহও হবে না। তা নফল হিসেবেই গণ্য হবে। –তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/২৩৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫২; আলবাহরুর রায়েক ১/২৫৩; রদ্দুল মুহতার ১/৩৭৪

আবদুল্লাহ আবরার
জকিগঞ্জ, সিলেট

৪২৮৯ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে আযানের দায়িত্ব নিকটবর্তী হিফজখানার ছাত্ররা পালন করে

Scanned by CamScanner

থাকে। যাদের অধিকাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক। প্রশ্ন হল, অপ্রাপ্তবয়স্কদের আযান দেওয়া সহীহ কি না?

উত্তর : আযান প্রাপ্তবয়স্কদেরই দেওয়া উচিত। যদিও নামায ও আযানের বুঝ রাখে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে আযান দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। –আলমাবসূত, সারাখসী ১/১৩৮; আলবাহরুর রায়েক ১/২৬৪; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ. ১০৮

সারওয়ার হুসাইন
ওয়েব থেকে প্রাপ্ত

৪২৯০ প্রশ্ন : আমরা জানি যে, নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা গুনাহ। কিন্তু কখনো এমন হয় যে, নামায শেষে বসে তাসবীহ পাঠ করছি, এর মধ্যেই পেছনে তাকিয়ে দেখি আমার সোজা বরাবর পেছনে একজন নামায পড়ছে। এখন জানার বিষয় হল, নামাযী ব্যক্তির সামনে বসা থেকে উঠে চলে গেলে কি গুনাহ হবে?

উত্তর : নামাযী ব্যক্তির সামনে অবস্থানকারী প্রয়োজনে ডানে বা বামে সরে যেতে পারবে। এতে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার গুনাহ হবে না। হাদীস শরীফে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচল করা বা আসা-যাওয়া করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য নামাযীর সামনে অবস্থানকারী ব্যক্তির প্রয়োজন না থাকলে অপেক্ষা করাই ভালো। –ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১০৪; ফাতহুল বারী ১/৬৯১; রদ্দুল মুহতার ১/৬৩৬; ইলাউস সুনান ৫/৮১; ইমদাদুল আহকাম ১/৮০৯

আশরাফ
নোয়াখালী

৪২৯১ প্রশ্ন : নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর নামায আদায়ের পূর্বেই জনৈকা মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হয়। জানার বিষয় হল, পরবর্তীতে পবিত্র হওয়ার পর সে মহিলাকে উক্ত ওয়াক্তের নামায কাযা করতে হবে কি?

উত্তর : না, ঐ ওয়াক্ত নামাযের কাযা করতে হবে না। কেননা ওয়াক্তের শুরুতে পবিত্র থাকলেও ওয়াক্তের ভেতরেই যেহেতু হায়েয এসে গেছে তাই ঐ নামায মাফ হয়ে যাবে। তা আর পড়তে হবে না। –কিতাবুল আছার ১/৮৪; আলমাবসূত, সারাখসী ২/১৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৩২; আততাজনীস ওয়াল মাযীদ ১/১৮৯; ফাতহুল কাদীর ১/১৫২

মুহাম্মাদ ফযলুল্লাহ
শিবচর, মাদারীপুর

৪২৯২ প্রশ্ন : অনেক সময় দেখা যায় যে, ফরয নামাযের জামাতে সামনের কাতারে জায়গা ফাঁকা রেখে মুসল্লীরা পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা ছাড়া সামনের কাতার পুরা করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কি তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয হবে?

উত্তর : কাতারের মাঝে ফাঁকা রাখা মাকরূহ তাহরীমী। কোনো জামাতের নামাযে সামনের কাতার খালি রেখে মুসল্লীরা পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে গেলে কাতার পুরা করার জন্য প্রয়োজনে ঐ মুসল্লীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে। এতে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমের গুনাহ হবে না। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৫৭২৪; রদ্দুল মুহতার ১/৬৩৬; আদ্দুররুল মুনতাকা ১/১৮৪; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ্দুর ১/২৬৯

মুহাম্মাদুল্লাহ
কুমিল্লা

৪২৯৩ প্রশ্ন : কেউ যদি ফজরের সুন্নত নামায ঘরে পড়ে মসজিদে যায় তাহলে সে মসজিদে গিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়তে পারবে কি?

উত্তর : না, ফজরের সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়া যাবে না। কারণ, সুবহে সাদিকের পরে ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ব্যতীত অন্য কোনো নফল নামায পড়ার নিয়ম নেই। হাদীস শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

সুবহে সাদিকের পরে (ফজরের) দুই রাকাত (সুন্নত) ব্যতীত অন্য কোনো (নফল) নামায নেই। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৪৭৫৬) –কিতাবুল আছল ১/১৩২; বাদায়েউস সানায়ে ২/১৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/১৯

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
চাটখিল, নোয়াখালী

৪২৯৪ প্রশ্ন : আমি গতকাল আসরের নামাযে ইমাম সাহেবকে শেষ বৈঠকে পাই এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পরে বাকি নামায পুরা করি। নামাযের পর এক ব্যক্তি বলল, আপনার নামায পুনরায় পড়তে হবে। কারণ ইমাম সাহেব সিজদায়ে সাহু করার পরে আপনি নামাযে শরীক হয়েছেন। এ সময় ইমামের ইক্তেদা করা সহীহ নয়।

হুযুরের কাছে জানতে চাই, উক্ত ব্যক্তির কথা কি ঠিক? আমার নামায কি পুনরায় পড়তে হবে?

উত্তর : ইমাম সিজদায়ে সাহু করার পরও তার ইক্তেদা করা সহীহ। অতএব আপনার নামায সহীহভাবে আদায় হয়েছে। ঐ ব্যক্তির কথা ঠিক নয়। না জেনে দ্বীনী বিষয়ে এভাবে মন্তব্য করা অন্যায়। –আলমাবসূত, সারাখসী ২/১১২; বাদায়েউস সানায়ে ১/৪২৩; ফাতাওয়া খানিয়া ১/১২৩; ফাতাওয়া সিরাজিয়া পৃ. ১৩; তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৪৮৪

মুহাম্মাদ ইসহাক
মাধবপুর, হবিগঞ্জ

৪২৯৫ প্রশ্ন : আমি একজন মক্তবের শিক্ষক। বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফ পড়াই। তাদের সবক শোনার সময় অনেক ক্ষেত্রে সিজদার আয়াত আসে এবং কখনও কখনও একই আয়াত একাধিক ছাত্র থেকে শুনতে হয়। হযরতের কাছে জানতে চাই, যদি এক বৈঠকে একই আয়াত একাধিক ছাত্র থেকে শুনি তাহলে কি একাধিক সিজদা করতে হবে?

উত্তর : এক বৈঠকে একই আয়াত একাধিক ব্যক্তি থেকে শুনলে একটি সিজদাই ওয়াজিব হয়। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে একই আয়াত একাধিক ছাত্র থেকে শুনলেও একটি সিজদাই যথেষ্ট হবে। একাধিক সিজদা করতে হবে না। –কিতাবুল আছল ১/২৮১; ফাতাওয়া খানিয়া ১/১৫৯; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৪/৬৮; মারাকিল ফালাহ পৃ. ২২৯; রদ্দুল মুহতার ২/১১৪

জানাযা-দাফন

মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম
নোয়াখালী

৪২৯৬ প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমার কয়েকজন আত্মীয় মামার বাড়িতে এসে তাদের মামার কবর যিয়ারত করার ইচ্ছা করে এবং তারা আমাকে সাথে নিয়ে যায়। তখন আমার উপর গোসল ফরয ছিল। আমি লজ্জার কারণে তাদের সামনে অপারগতা প্রকাশ করতে পারিনি ; বরং তাদের সাথে কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করেছি। হুযুরের কাছে আমার জানার বিষয় হল, গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কবর যিয়ারত পবিত্র অবস্থায় করা উচিত। তবে কোনো কারণে গোসল ফরয অবস্থায় কবর যিয়ারত করে ফেললে গুনাহ হবে না। তবে এ অবস্থায় কুরআনের কোনো সূরা বা আয়াত পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। –ফাতাওয়া সিরাজিয়া পৃ. ৮; আদ্দুররুল মুখতার ১/২৯৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১/৪৮১

মুহাম্মাদ ইয়াসিন
সিলেট

৪২৯৭ প্রশ্ন : কিছুদিন আগে আমাদের এলাকার একজন মুরুব্বী ইন্তেকাল করেন। তার মুমূর্ষু অবস্থায় মসজিদের ইমাম সাহেবসহ আমরা কিছু লোক সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন তাকে কীভাবে শোয়ানো হবে এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইমাম সাহেব তাকে উত্তর দিকে মাথা ও দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে চেহারা কেবলার দিকে ফিরিয়ে শোয়াতে চাচ্ছিলেন। একজন এতে বাধা দিয়ে বলল, 'বেহেশতী জেওর' কিতাবে পশ্চিম দিকে পা ও পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে এবং মাথার নিচে উঁচু কোনো বস্তু দিয়ে শোয়াতে বলা হয়েছে। যেন চেহারা পশ্চিম দিকে হয়ে যায়। জানার বিষয় হল, এক্ষেত্রে উত্তম এবং সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি কোনটি? জানালে উপকার হবে।

উত্তর : মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যদি সহজে কিবলা-মুখী করে শোয়ানো সম্ভব হয় তাহলে সেভাবেই শোয়ানো উত্তম হবে। আর কিবলামুখী শোয়ানোর দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হল, বেহেশতী জেওরে উল্লেখিত পদ্ধতি। আরেকটি হল, আমাদের দেশের হিসাবে উত্তর দিকে রোগীর মাথা ও দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে ডান কাত করে শোয়ানো। এটি অধিক উত্তম ও সুন্নাহসম্মত। তাই সম্ভব হলে এভাবে শোয়ানো উত্তম হবে। অন্যথায় বেহেশতী জেওরে যেভাবে শোয়ানোর কথা আছে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে পা ও পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে এবং মাথার নিচে উঁচু কোনো বস্তু দিয়ে কিবলামুখী করে শোয়াবে। কিন্তু যদি কিবলামুখী করে শোয়ানো সম্ভব না হয় তাহলে যেভাবে শোয়ালে তার জন্য সহজ ও আরামদায়ক হয় সেভাবে শোয়াবে। –মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, বর্ণনা ৬০৫৯; বাদায়েউস সানায়ে ২/২২; ফাতহুল কাদীর ২/৬৭; শরহুল মুনয়া পৃ. ৫৭৬; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৫৯৬; হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী পৃ. ৩০৫; রদ্দুল মুহতার ২/১৮৯; ইমদাদুল আহকাম ১/৮২০

সপ্তম-ইতিকাফ

আবদুল্লাহ
লাকসাম, কুমিল্লা

৪২৯৮ প্রশ্ন : আমি রোযা রেখে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছিলাম। তখন মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমার মুখে কিছু বৃষ্টির পানি ঢুকে ভেতরে চলে যায়। হুযুরের কাছে জানতে চাই, আমার রোযা কি ভেঙ্গে গেছে এবং ভেঙ্গে গেলে কি শুধু কাযা করতে হবে নাকি কাফফারাও দিতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি যদি বাস্তবেই গলায় চলে যায়, তাহলে উক্ত রোযা ভেঙ্গে গেছে। রোযাটির কাযা করে নিতে হবে। তবে কাফফারা দিতে হবে না। –খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩; রদ্দুল মুহতার ২/৪০৩; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ১/৯৮

যাকাত-সদাকা

আবদুল্লাহ যায়েদ
চৌমুহনী

৪২৯৯ প্রশ্ন : আমি একজন চাল ব্যবসায়ী। আমার জন্য চাল দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করা সহজ। হযরতের কাছে জানতে চাই, চাল দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায় করলে আদায় হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, চাল বা অন্য খাদ্যশস্য দ্বারাও সদকায়ে ফিতর আদায় করা যাবে। সেক্ষেত্রে ১ কেজি ৬৩৫ গ্রাম গম অথবা ৩ কেজি ২৭০ গ্রাম খেজুর বা যবের মূল্যের সমপরিমাণ চাল দিতে হবে। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ১০৪৭২; কিতাবুল আছল ২/১৮০; আলমাবসূত, সারাখসী ৩/১১৪; ফাতাওয়া ওয়ালওয়ালিজিয়্যা ১/২৪৭; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪৫৫

রাজিয়া সুলতানা
মুরাদনগর, কুমিল্লা

৪৩০০ প্রশ্ন : আমার কাছে কিছু ব্যবহারের স্বর্ণালংকার আছে, যা নেসাবের সমপরিমাণের কিছু বেশি হবে। আমি মনে করতাম সাধারণ স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত আদায় করতে হয়। ব্যবহারের স্বর্ণালংকারের যাকাত আদায় করতে হয় না। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে জনৈক আলেমে দ্বীনের ওয়াজে শুনলাম, ব্যবহারের স্বর্ণালংকারের যাকাত আদায় করতে হবে। অন্যথায় গুনাহগার হতে হবে।
অতএব আমার জানার বিষয় হল, উক্ত আলেমের কথা কি ঠিক? ব্যবহারের স্বর্ণালংকারেরও কি যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত আলেমে দ্বীন ঠিকই বলেছেন। স্বর্ণালংকার ব্যবহারের জন্য হলেও এর যাকাত দিতে হয়। তাই ব্যবহৃত স্বর্ণ নেসাব পরিমাণ হলে বছর শেষে এর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। হাদীস শরীফে হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি এবং আমার খালা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন তার হাতে স্বর্ণের চুড়ি ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এর যাকাত আদায় কর? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, তোমাদের কি এ ভয় হয় না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ কারণে আগুনের চুড়ি পরাবেন? তোমরা এর যাকাত আদায় কর। (মুসনাদে আহমাদ , হাদীস ২৭৬১৪) –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৫৮; কিতাবুল আছল ২/৯২; শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৩১৩; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৪৯; আদ্দুররুল মুখতার ৫/৫৪৬

রাগিব হাসান
বাড্ডা, ঢাকা

৪৩০১ প্রশ্ন : পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাসের জন্য বর্তমানে আমার কোনো বাড়ি নেই। বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি। আমার তিন কাঠা জমি আছে। শীঘ্রই সেখানে বাড়ি করতে চাচ্ছি। তাই এ উদ্দেশ্যে টাকা জমা করছি। জানতে চাচ্ছি, উক্ত উদ্দেশ্যে জমাকৃত টাকার কি যাকাত দিতে হবে? দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : হ্যাঁ, বাড়ি বানানোর উদ্দেশ্যে সঞ্চয়কৃত নগদ টাকা বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত খরচ না হলে এর যাকাত দিতে হবে। পূর্ব থেকে নেসাবের মালিক হলে যাকাতবর্ষ শেষে এই জমা টাকাসহ যাকাত দিবেন। আর আগে থেকে যাকাতের নেসাবের মালিক না হলে জমা টাকা নেসাব পরিমাণ হওয়ার পর থেকে এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।
প্রকাশ থাকে যে, কোনো ভবিষ্যত-প্রয়োজনকে সামনে রেখে টাকা জমা করলে যদি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন ঐ টাকা যেহেতু বিগত বছরের জন্য প্রয়োজন-অতিরিক্ত ছিল তাই এর যাকাত দিতে হয়।
উল্লেখ্য যে, আপনি যদি বছর পূর্ণ হওয়ার

Scanned by CamScanner

আগেই বাড়ি করার জন্য নির্মাণ-সামগ্রী কিনে ফেলেন তবে সেগুলোর যাকাত দিতে হবে না। -আলবাহরুর রায়েক ২/২০৬; আননাহরুল ফায়েক ১/৪১৫; রদ্দুল মুহতার ২/২৬২; ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/২৯

হজ্ব-উমরা

মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৪৩০২ প্রশ্ন : আমার ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঢাকা থেকে জেদ্দা যাওয়া প্রয়োজন। সময় স্বল্পতার কারণে এবার মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা নেই। আমার জন্য কি ইহরামবিহীন জেদ্দায় যাওয়া জায়েয হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, ইহরাম ছাড়াই জেদ্দায় যেতে পারবেন। কেননা মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা না থাকলে জেদ্দা যাওয়ার জন্য ইহরাম করা লাগে না। এক্ষেত্রে মীকাত অতিক্রম করতে ইহরামের প্রয়োজন নেই। -আলমাবসূত, সারাখসী ৪/১৬৮; শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৫১৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৭৭; আলইখতিয়ার ১/৪৪৩; মাজমাউল আনহুর ১/৪৪৮

নিকাহ-তালাক

আদিবা তাসনীম
ওয়েব থেকে প্রাপ্ত

৪৩০৩ প্রশ্ন : আমাদের দূর-সম্পর্কীয় দু'জন নানা আছেন। তারা সম্পর্কে আমাদের মায়ের মামা। পারিবারিকভাবে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে আমরা ছোটবেলা থেকেই তাদের বাসায় আসা যাওয়া করি। কিন্তু এখন আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, তারা আমাদের মাহরাম কি না? তাদের সাথে আমাদের পর্দা করতে হবে কি না? বিষয়টি নিয়ে পেরেশানিতে আছি। দ্রুত জানাবেন।

উত্তর : তারা যদি আপনার মায়ের মামা হয়ে থাকেন অর্থাৎ আপনার নানীর ভাই হয়ে থাকে (বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় হলেও) তাহলে আপনারা তাদের ভাগিনীর মেয়ে। আর ভাগিনীকে কুরআনে কারীমে মাহরাম বলা হয়েছে। মুফাসসিরীন ও ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, ভাগিনীর অধস্তন মেয়েরাও মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তারা আপনাদের মাহরাম। তাদের সাথে আপনাদের পর্দা করতে হবে না।

আর যদি তারা আপনার নানীর আপন, বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভাই না হয়ে থাকেন, বরং দূর-সম্পর্কের ভাই হন তাহলে তাদের সাথে আপনাদের পর্দা করতে হবে। -কিতাবুল আছল ৪/৩৫৮; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৩৬০; বাদায়েউস সানায়ে ২/৫৩০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৩

এলাকাবাসীর পক্ষে আবু খুবাইব
সদর, কুমিল্লা

৪৩০৪ প্রশ্ন : মুহতারাম মুফতী সাহেব! আমাদের এলাকায় একটি ঘটনা নিয়ে খুব তোলপাড় হচ্ছে। বিষয়টির সমাধান জানিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করবেন। ঘটনাটি বোঝানোর জন্য আমরা ছদ্মনাম ব্যবহার করছি। ঘটনাটি হল, জনাব আবু বকর সাহেবের দুই স্ত্রী ছিল। যায়নাব ও হাফসা। যায়নাবের ঘরে তার মেয়ে ফাতেমা। আর হাফসার ঘরে তার মেয়ে আয়েশা। আয়েশার ছেলে আবদুর রহমান। আবদুর রহমানের ছেলে আবদুল্লাহ। এই আবদুল্লাহ যায়নাবের মেয়ে ফাতেমাকে বিয়ে করেছে। কেউ এই বিয়েকে জায়েয বলছেন, কেউ নাজায়েয বলছেন। সঠিক মাসআলাটি আলকাউসারে ছাপানোর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আবদুল্লাহর জন্য যায়নাবের মেয়ে ফাতেমাকে বিয়ে করা জায়েয হয়নি। কেননা, ফাতেমা আবদুল্লাহর পিতার খালা। আর পিতার খালা মাহরাম নারীদের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে আপন খালা, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় খালার হুকুম একই।

অতএব তাদের কর্তব্য হল, এখনই পৃথক হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা-ইস্তেগফার করা। -আহকামুল কুরআন, জাসসাস ২/১২৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/৫৩০; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৩৬০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৭৩

আবু সাফওয়ান
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

৪৩০৫ প্রশ্ন : মুহতারাম! একটি বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। তা হল, ১০/১২ বছর আগে আমার এক আত্মীয়ার তালাক হয়েছিল। তখন তার একটি দুধের বাচ্চা ছিল। তালাক হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে অন্যত্র তার বিবাহ হয়। যে লোকটির সাথে তার বিবাহ হয়, তার অন্য স্ত্রীর ঘরে একটি ছেলে আছে। তখন ছেলেটির বয়স ৪ বছর ছিল। আর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করার সময়ও আমার আত্মীয়া তার প্রথম সংসারের সেই দুধের শিশুটিকে দুধ পান করিয়েছে। এই শিশুটি মেয়ে শিশু। এখন সে বড় হয়েছে। এখন পারিবারিকভাবে এই মেয়েটির সাথে আমার আত্মীয়ার দ্বিতীয় স্বামীর ছেলের বিবাহ দেওয়ার কথাবার্তা চলছে। কিন্তু কেউ কেউ বলছে, এই বিবাহ বৈধ হবে না। কারণ, তারা দু'জন তো দুধ ভাই-বোন। কেননা, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংসার করার সময়ও তো আমার আত্মীয়া তার মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে। এভাবে দ্বিতীয় স্বামী তো মেয়েটির দুধ সম্পর্কীয় বাবা হয়। আর ছেলেটি হয় মেয়েটির দুধ ভাই। এখন হুযুরের নিকট আমরা জানতে চাচ্ছি যে, তারা দু'জন কি দুধ ভাই বোন? এবং তাদের মধ্যে কি বিবাহ অবৈধ? আশা করি, সঠিক মাসআলা জানিয়ে আমাদেরকে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ছেলে-মেয়ের মাঝে বিবাহ জায়েয হবে। তারা দুধ ভাই-বোন নয়। আপনার আত্মীয়ার দ্বিতীয় স্বামী এ মেয়েটির দুধপিতা নয়। কেননা মহিলা তার দ্বিতীয় স্বামীর কাছে থাকা অবস্থায় মেয়েটিকে দুধ পান করালেও এই সন্তান ও তার বুকের দুধে দ্বিতীয় স্বামীর কোনো অংশ ও প্রভাব নেই। তাই দ্বিতীয় স্বামী মেয়েটির দুধপিতা বলে গণ্য হবে না। -বাদায়েউস সানায়ে ৩/৪০৯; আলমাবসূত, সারাখসী ৫/১৩৩; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৪/৩৭০; আদ্দুররুল মুখতার ৩/২২১

ওয়াক্ফ

রায়হান ফিরদাউস
ওয়েব থেকে প্রাপ্ত

৪৩০৬ প্রশ্ন : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় যে সমস্ত ফলের গাছ আছে সেগুলোর ফল পাশের মাদরাসার ছাত্ররা খেতে পারবে কি না? আসলে এ ফলগুলোর হকদার কারা? বিষয়টি নিয়ে এলাকায় খুব সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত সমাধান জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গার গাছের ফল মসজিদের সম্পদ। তা বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকা মসজিদের ফান্ডে সংরক্ষণ করতে হবে, যা মসজিদের প্রয়োজনে বা উন্নয়নে খরচ করা হবে। মাদরাসার ছাত্র, এলাকাবাসী বা অন্য কারো জন্য বিনামূল্যে তা খাওয়া জায়েয হবে না। খেতে চাইলে কর্তৃপক্ষ থেকে তা ক্রয় করে নিতে হবে। -ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩১০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/৪৭৭; আলবাহরুর রায়েক ৫/২০৪; আলইসআফ পৃ. ২২; রদ্দুল মুহতার ৪/৪৩২

সাইফুল ইসলাম
মালিবাগ, ঢাকা

৪৩০৭ প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি একটি মসজিদ ওয়াকফ করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই সেই মসজিদের মুতাওয়াল্লী

Scanned by CamScanner

ছিলেন। এখন তার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে মুতাওয়াল্লী হতে চাচ্ছে। সে বলছে, 'আমার বাবা এই মসজিদ ওয়াক্‌ফ করেছেন এবং তিনি মুতাওয়াল্লীও ছিলেন। এখন তার মৃত্যুর পরে তার বড় ছেলে হিসেবে আমিই এই মসজিদের মুতাওয়াল্লী হব।' কিন্তু এলাকাবাসী তাকে মুতাওয়াল্লী বানাতে চাচ্ছে না। অবশ্য অল্প কিছু মানুষ তাকে সমর্থন করছে। কিন্তু বাকিরা অন্য একজনকে মুতাওয়াল্লী বানাতে চাচ্ছে। আর ওয়াক্‌ফকারীও তার সন্তান মুতাওয়াল্লী হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলে যাননি। এখন আমরা জানতে চাচ্ছি যে, এমতাবস্থায় আমাদের কী করণীয়?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে মৃত মুতাওয়াল্লীর বড় ছেলে যদি মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্য অর্থাৎ নামাযী ও আমানতদার হন এবং তার মধ্যে মসজিদ পরিচালনার যোগ্যতা থাকে, তাহলে তাকে মুতাওয়াল্লী বানাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং বিশেষ কোনো সমস্যা না থাকলে তিনি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। আর যদি তিনি মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্য না হন, তাহলে মুসল্লীরা অন্য কোনো যোগ্য ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী বানাতে পারবেন। এতে মুতাওয়াল্লীর ওয়ারিশদের জন্য হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না। -আলমুহীতুল বুরহানী ৯/২৩; আলমাবসূত, সারাখসী ১২/৪৪; আলবাহরুর রায়েক ৫/২৩২; মাজমাউল আনহুর ২/৬০৩; আদ্দুররুল মুখতার ৪/৪২৪

মুআমালা-লেনদেন

দুলাল মিয়া
টঙ্গী, গাজীপুর

৪৩০৮ প্রশ্ন : আমার ভাই এক চাষীকে এই শর্তে ধানি জমি বর্গা দিয়েছে যে, ধান উৎপন্ন হওয়ার পরে চাষী আমার ভাইকে পাঁচ মন ধান দিবে। আর বাকিটা সে নিবে। আমার ভাই চাষীকে বীজও দিয়েছেন। আর আমাদের জমিতে প্রায় ১০-১২ মন ধান হয়। আমরা জানতে চাচ্ছি যে, এভাবে জমি বর্গা দেওয়া কি ঠিক হয়েছে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার ভাই যেভাবে জমি বর্গা দিয়েছে তা জায়েয হয়নি। কেননা, আপনার ভাই নিজের জন্য পাঁচ মন ধান পাওয়ার শর্ত করেছে। আর বর্গা চাষে উভয় পক্ষের কারো জন্য ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা জায়েয নয়। বৈধভাবে করতে চাইলে ফসল শতকরা হারে বণ্টনের চুক্তি করা আবশ্যক। যেমন, এভাবে চুক্তি করা যে, উৎপাদিত ফসলের ৬০% নিবে চাষী, আর ৪০% নিবে জমির মালিক। অথবা উভয়ের সম্মতিতে অন্য যে কোনো পরিমাণও ঠিক করা যেতে পারে। আর এক্ষেত্রে বীজ যেহেতু আপনার ভাই দিয়েছে তাই জমির পুরো ফসল সে পাবে, আর চাষী তার কাজের পারিশ্রমিক পাবে। -আলমাবসূত, সারাখসী ২৩/১৯; বাদায়েউস সানায়ে ৫/২৫৮; আলমুহীতুল বুরহানী ১৮/৩৫৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৩৫, ২৩৮; আদ্দুররুল মুখতার ৬/২৭৬, ২৭৯

মুহিব্বুল্লাহ
ফেনী

৪৩০৯ প্রশ্ন : আমি ও আমার বন্ধু মিলে দশ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি চালের আড়ত দিয়েছি।

আমার পুঁজি চার লক্ষ টাকা আর বন্ধুর ছয় লক্ষ টাকা। ব্যবসা পরিচালনা আমি একাই করি। তাই তার সাথে আমার চুক্তি হয় যে, লাভের ৩৩% তার আর বাকিটা আমার। আর লোকসান হলে অর্ধেক সে বহন করবে আর বাকি অর্ধেক আমি। সে এতে রাজি হয়। প্রশ্ন হল, এভাবে চুক্তি করা কি বৈধ হয়েছে?

উত্তর : লভ্যাংশ কমবেশি করে বণ্টন করার চুক্তিটি বৈধ হয়েছে। তবে লোকসান অর্ধাঅর্ধি হারে বহন করার শর্ত করা বৈধ হয়নি। অবশ্য এ কারণে পুরো চুক্তি বাতিল হয়ে যায়নি। শুধু এ শর্তটি বাতিল গণ্য হবে। সুতরাং আপনারা উক্ত ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে চুক্তিটি এভাবে সংশোধন করে নিতে হবে যে, লোকসান হলে প্রত্যেককে নিজ নিজ মূলধন অনুপাতে তা বহন করতে হবে। অর্থাৎ যে ছয় লক্ষ টাকা প্রদান করেছে সে ৬০% এবং যে চার লক্ষ টাকা প্রদান করেছে সে ৪০% লোকসান বহন করবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৫/৮৩; ফাতহুল কাদীর ৫/৩৯৭; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৭/৪৯১; রদ্দুল মুহতার ৪/৩০৫

ইয়াকুব
গাজীপুর

৪৩১০ প্রশ্ন : আমি গ্রামের এক চাষীকে এক লক্ষ টাকা এই শর্তে দিয়েছি যে, তিন মাস পর সে আমাকে পাঁচ শত টাকা মন হিসেবে দুইশ মন ধান দিবে। টাকা দেওয়ার এক মাস পরেই আমার একটি ছেলে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন আমার বড় ভাই থেকে ৫০,০০০/- টাকা এই বলে ঋণ নিয়েছি যে, দু'মাস পর ঐ কৃষক দুইশ মন ধান দিলে আমরা দু'জনে একশত মন করে ভাগ করে নিব। আর এভাবে তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। জানার বিষয় হল, ভাইয়ের সাথে এই ঋণ চুক্তিটি কি সহীহ হয়েছে? দয়া করে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার ভাই থেকে ঋণ নিয়ে বিনিময়ে আপনার পাওনা ধান দেওয়ার চুক্তি করা বৈধ হয়নি। কেননা আপনাদের এ লেনদেন মূলত কৃষক থেকে আগাম চুক্তিতে ক্রয়কৃত ধানের বিক্রি চুক্তি। আর আগাম চুক্তিতে ক্রয়কৃত পণ্য হস্তগত করার পূর্বে তা অন্যত্র বিক্রি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া জায়েয নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার কর্তব্য হল ৫০,০০০/- টাকাই ফেরত দেওয়া। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/৩৪৩; আলবাহরুর রায়েক ৬/১৬৪; রদ্দুল মুহতার ৫/২১৮

তৌহিদুল ইসলাম
মাধবদী, নরসিংদী

৪৩১১ প্রশ্ন : নানা মারা যাওয়ার পর আমার দুই মামা অনেক সম্পদ পেয়েছেন। এখনো তা অবণ্টিত। বড় মামা ঢাকায় থাকার কারণে গ্রামের জায়গা জমি দেখাশুনা করতে পারেন না। এদিকে ছোট মামা সব জমিতে চাষ করে নিজে একাই ভোগ করেন। গাছের ফল-ফলাদি সে একাই নেয়। এতদিন বড় মামা কিছু বলেননি। একদিন দু'জনের কথা কাটাকাটিতে বড় মামা বললেন, আমার দু'বছরের ৯০ আড়ি ধান, আর গাছের ফল-ফলাদির ৪০ হাজার টাকা দিয়ে দিতে হবে। ছোট মামা বলে, সবগুলো আমি দেখাশুনা করেছি। আপনি কিছু পাবেন না। পরবর্তীতে তারা দু'জনই অনুতপ্ত হয়। এখন উভয়ে উভয়ের করণীয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে।

১. সব জমিতে ছোট মামার চাষ করাটা অন্যায় হলে এখন তার কী করতে হবে?

২. চাষের এক অংশ বড় মামাকে দিতে হবে কি না?

৩. ছোট মামা ফল-ফলাদি কিছু খেয়েছেন কিছু বিক্রি করেছেন। এ বিষয়ে কী করতে হবে? দয়া করে সব বিষয় জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, মনোমালিন্য হওয়ার আগে বড় ভাইয়ের মৌন সম্মতি ও সমঝোতার মাধ্যমেই ছোট ভাই চাষাবাদ ও বাগান দেখাশোনা করে আসছিল। ছোট জনের এসব কাজে বড় জনের কোনো আপত্তি ছিল না। এরপর কোনোদিন হয়ত রাগ হওয়ার কারণে আপনার বড় মামা ঐ কথাগুলো বলেছেন। তাই এতদিন যাবৎ উক্ত জমিগুলোতে আপনার ছোট মামার চাষ করাটা অন্যায় হয়নি। এবং এতদিন ছোট ভাই যেহেতু

Scanned by CamScanner

নিজেই চাষবাস করেছে, বড় ভাই তাতে কোনো অংশ দাবি করেনি তাই সব ফসলের মালিক সেই হবে। তবে যেদিন থেকে বড় ভাই আপত্তি করেছে সেদিনের পর থেকে চাষাবাদ করতে হলে হয় প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ ভাগ করে নিয়ে তাতে করবে, অন্যথায় বর্গা ইত্যাদি কোনো শরীয়তসম্মত পন্থায় করবে। এমনিভাবে জমিতে যদি ফলগাছ থাকে তাহলে তার ফলফলাদি সমানভাবে ভাগ করে নিবে।

উল্লেখ্য যে, মীরাসী সম্পত্তি যত দ্রুত সম্ভব বণ্টন করে নেওয়া শরীয়তের নির্দেশ। এ নির্দেশ পালন করলে এ ধরনের ঝগড়া-বিবাদে পড়ার আশংকা থাকে না। –আলবাহরুর রায়েক ৫/১৬৭; রদ্দুল মুহতার ৪/৩০৪; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা ১০৭৬, ১০৮৯, ১০৮৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৭/৫১৪; শরহুল মাজাল্লা, খালেদ আতাসী ৪/১৯

আবদুল্লাহ আল মামুন
মনিরামপুর, যশোর

৪৩১২ প্রশ্ন : গত ঈদে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার জন্য বাসের টিকেট কাটতে গিয়ে দেখি টিকেট শেষ। মন খারাপ করে ফিরে আসছিলাম। এক লোক ডেকে বলল, আমার কাছে একটা টিকেট আছে। ৫০০ টাকায় হলে নিতে পারবেন। আমার খুব প্রয়োজন ছিল। তাই নিরুপায় হয়ে ৪০০ টাকার টিকেট ৫০০ টাকায়ই কিনে নিলাম। জানতে চাচ্ছি, এভাবে যারা বাস বা ট্রেনের টিকেট কিনে রেখে পরবর্তীতে মানুষের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে তাদের এ কাজটা কি ঠিক? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ঐ ব্যক্তির জন্য ৪০০ টাকার টিকেট ৫০০ টাকায় বিক্রি করা জায়েয হয়নি। এই অতিরিক্ত টাকা তার গ্রহণ করা নাজায়েয। টিকেট কিনে এভাবে ব্যবসা করা জায়েয নয়। কেননা একটি টিকেট কেনার অর্থ হল একটি সিট ভাড়া নেওয়া। আর এভাবে সিট ভাড়া নিয়ে বেশি ভাড়ায় অন্যের কাছে হস্তান্তর করা নাজায়েয। –আলমাবসূত, সারাখসী ১৫/১৩০; আলমুহীতুল বুরহানী ১১/২৬৮;

মামুন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪৩১৩ প্রশ্ন : আমি একজনকে ২,০০০/- টাকা কর্জ দিলাম। বর্তমান বাজারমূল্য হিসেবে এ দ্বারা ৪০ কেজি খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। আমি তাকে বললাম, ১ বছর পর ফেরত দিলেই চলবে। ইত্যবসরে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় উক্ত টাকায় ২৫ কেজি খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। এখানে যদি আমি ৩,২০০ টাকা পেতাম তাহলে পূর্বের ন্যায় ৪০ কেজি শস্য কিনতে পারতাম। এক্ষেত্রে শরীয়তের ফয়সালা কী? আমি এহসান করব? তার কাছ থেকে সুদ হিসেবে অতিরিক্ত কিছু নেব এমন আগ্রহ আমার নেই; কিন্তু আমি ক্ষতিগ্রস্ত কেন হব?

আবার দাম যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে ধরা যাক উক্ত টাকায় ৫০ কেজি শস্য পাওয়া যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার জন্য (২,০০০/- টাকার কম) ৪০ কেজির দাম ১,৬০০ টাকা দেওয়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : আপনি যদি কাউকে ৪০ কেজি ধান ঋণ দেন তবে বছর শেষে আপনি সে পরিমাণ অর্থাৎ ৪০ কেজি ধানই নিবেন। সেক্ষেত্রে ধানের দাম যদি অর্ধেক হয়ে যায় তবুও আপনি বেশি নিতে পারবেন না। আবার ধানের দাম বেড়ে গেলেও আপনি কম নিবেন না। টাকার ঋণের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তেমনি। সাধারণ গতিতে এর বিনিময়মূল্য কিছুটা বেড়ে বা কমে গেলেও করজে হাসানার ক্ষেত্রে তা বেশ-কম করা যায় না; বরং যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়েছিল সে পরিমাণই ফেরত নিতে পারবেন।

উল্লেখ্য, করজে হাসানা দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি ফযীলতপূর্ণ ও মহৎ আমল। সাধারণতঃ বাহ্যিকভাবে অর্থনৈতিক কিছু ক্ষতি মেনে নিয়েই তা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী মানসিকতা পোষণ করা ও সংকীর্ণমনা হওয়া উচিত নয়। ঋণ দেওয়ার কারণে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা মেনে নেওয়ার কারণেই এতে অর্থ সদকা করার সওয়াব পাওয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৩৯১১, –মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা ৫, ৩/২২৬১; ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/২৬

ইসমাইল হুসাইন
লালমনিরহাট

৪৩১৪ প্রশ্ন : আমি জালালাইন জামাতে পড়ার সময় আমার এক আত্মীয়ের কাছে কিতাব কেনার জন্য ৫০০০/- টাকা ঋণ চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে ৫০০০/- টাকা হাদিয়া দিয়েছেন এবং বলেছেন, এ টাকা তোমাকে হাদিয়া দিলাম কিতাব কেনার জন্য। কিন্তু এর দু'দিন পর একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে আমার মুখে আঘাত পাই। এর চিকিৎসা বাবদ উক্ত টাকা খরচ হয়ে যায়। খরচ করার সময় ইচ্ছা ছিল পরে কিতাব কিনে নিব। কিন্তু এখনো সুযোগ হয়নি। মাঝে মধ্যে পেরেশানী হয় এবং ঐ আত্মীয়ের সামনে যেতে লজ্জাবোধ করি। কিছুদিন আগে এক ভাই বললেন, ঐ টাকার মালিক নাকি আমি। তাই আমি যে কোনো খাতে তা খরচ করতে পারব। জানতে চাচ্ছি তার কথা কি ঠিক?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে উক্ত হাদিয়ার টাকা চিকিৎসা বাবদ খরচ করা অন্যায় হয়নি। কিতাব ক্রয়ের কথা বললেও তিনি যেহেতু আপনাকে টাকাগুলোর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন তাই নিজ প্রয়োজনে তা অন্যত্র ব্যয় করা বৈধ হয়েছে। তবে দাতা যেহেতু ঐ টাকা কিতাব ক্রয়ের জন্য দিয়েছেন তাই তা সে খাতে ব্যয় হলেই ভাল হত। –আলমাবসূত, সারাখসী ১২/৯৬; আলবাহরুর রায়েক ৭/২৮৫; আদ্দুররুল মুখতার ৫/৬৮৯

ইসমাইল হুসাইন
লালমনিরহাট

৪৩১৫ প্রশ্ন : আমার বড় ভাইয়ের সাথে একটি বিষয়ে লেনদেন করার সময় আমার নিকট ১০০০/- টাকা বেশি আসে। আমি তা জানা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দেইনি এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি বলেছি, হিসাব সব ঠিকঠাক আছে। বর্তমানে ঐ বিষয়টি নিয়ে আমার অনুশোচনা হচ্ছে। কিন্তু কী বলে ফিরিয়ে দিব– বুঝতে পারছি না। ঐ ঘটনা বললে তো অনেক লজ্জার বিষয়।

এক্ষেত্রে আমার কোনো এক বন্ধুকে বলতে শুনেছিলাম যে, হাদিয়ার কথা বলে দিলেও নাকি সেই টাকা পরিশোধ হয়ে যাবে। জানতে চাচ্ছি, এক্ষেত্রে হাদিয়ার কথা বলে দিলেও কি আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, 'হাদিয়া' বলে দিলেও আদায় হয়ে যাবে। তবে আপনার ঐ কাজটি যে খুবই অন্যায় হয়েছে তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। –ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/১৭১; জামিউল ফুসূলাইন ২/৫১; আদ্দুররুল মুখতার ৫/৯২; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, মাদ্দা : ৯৭, ৮৯৩; শরহুল মাজাল্লাহ, খালিদ আতাসী ১/২৬৪

কুরবানী-আকীকা

সফওয়ান মাহমুদ
রাজবাড়ি

৪৩১৬ প্রশ্ন : এ বছর আমরা দুই ভাই মিলে একটি গরু কুরবানী করার ইচ্ছা করেছি। তবে দুইজনের অংশ সমান নয়। একজনের সাড়ে তিন অংশ অপরজনের আড়াই অংশ।

Scanned by CamScanner

জানতে চাই, এমন অসমান শরীকানায় আমরা কুরবানী করতে পারব কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, এভাবে আপনারা কুরবানী করতে পারবেন। কুরবানীর পশুতে সকলের অংশ সমান হওয়া আবশ্যক নয়। তবে কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হওয়া জায়েয নয়। আর এক সপ্তমাংশের বেশি তা জোড়-বেজোড় বা ভগ্নাংশ যে কোনো পরিমাণেই হোক তাতে কোনো সমস্যা নেই। কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬; আলবাহরুর রায়েক ৮/১৭৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০৫

কাজী আবদুর রব
রংপুর

৪৩১৭ প্রশ্ন : আমি ঢাকায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে কাজ করি। এখানে বিভিন্ন আয়োজনে প্রায় প্রতিদিনই বিশ ত্রিশটি মুরগী জবাই করতে হয়। বড় কোনো আয়োজন থাকলে তো আরো বেশি। আমার জানার বিষয় হল, একসাথে অনেক মুরগী জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটির জন্য পৃথকভাবে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, নাকি শুরুতে একবার বিসমিল্লাহ বলে নিলেই চলবে? আশা করি দ্রুত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : একসাথে অনেক মুরগী জবাই করলেও প্রত্যেকটি জবাইয়ের পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। শুরুতে একবার বিসমিল্লাহ বললে শুধু প্রথমটির জবাই সহীহ হবে। পরবর্তী মুরগীগুলোর জবাই সহীহ হবে না এবং সেগুলো খাওয়াও হালাল হবে না।

উল্লেখ্য, পশু-পাখি হালাল হওয়ার জন্য শরীয়তের নির্ধারিত নিয়ম মেনে জবাই করা আবশ্যক। তাই এ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রতিটি জবাইয়ের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা এবং নির্ধারিত রগগুলো যথাযথভাবে কাটার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। -কিতাবুল আছল ৫/৩৯৮; আলমাবসূত, সারাখসী ১২/৪; আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫২; বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৭১; আলবাহরুর রায়েক ৮/১৬৯

হেবা-মীরাস

মারুফ বিল্লাহ
হোমনা, কুমিল্লা

৪৩১৮ প্রশ্ন : আমার বাবা মৃত্যুর পূর্বে তিন মাস ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। সে সময় তার ব্যবহারের মোটরসাইকেলটি তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী আযাদ আংকেলের জন্য অসিয়ত করেন। ইতিমধ্যে আযাদ আংকেল হঠাৎ সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেছেন। এর কিছুদিন পর আমার বাবাও ইন্তেকাল করেছেন। এখন আযাদ আংকেলের ছেলেরা সেই মোটরসাইকেলটি দাবি করছে। কিন্তু আমার বড় ভাই বলছেন, বাবা তো মোটরসাইকেলটি আযাদ আংকেলের জন্য অসিয়ত করেছিলেন, তার ছেলেদের জন্য নয়। আর আযাদ আংকেল তো বাবার আগেই ইন্তেকাল করেছেন। তাই তার ছেলেদের এটা পাওয়ার কথা না। জানতে চাচ্ছি, এখন এটি কাদের প্রাপ্য? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে আযাদ সাহেব যেহেতু আপনার বাবার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন তাই তার জন্য কৃত আপনার বাবার অসিয়তটি বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং তার ছেলে বা অন্য ওয়ারিশরা মোটরসাইকেলটি দাবি করতে পারবে না। তা আপনার বাবার মিরাছ হিসেবেই গণ্য হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৬/৪৩৩; আলমাবসূত, সারাখসী ২৭/১৫৯; আলবাহরুর রায়েক ৮/৪০৩; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৬৪৮

মুরতাযা আবরার রাফি
মোমেনশাহী

৪৩১৯ প্রশ্ন : আমরা ছয় ভাই দুই বোন। বোনদের বিবাহ হয়ে গেছে। তিন ভাইয়ের আলাদা সংসারও আছে। আমরা দুই ভাই আলেম ও হাফেজ। আমরা তিন ভাই আব্বা-আম্মার সাথে আছি। আমাদের মধ্যে বড় ভাইয়ের আমল ভাল। তাই আব্বা-আম্মা তাকে নিয়ে হজ্বে গেছেন। আর তাকে ও ভাবিকে আর্থিক সহযোগিতাও করেন। আমাদের ভাইদের আবদারে আব্বা হজ্ব থেকে এসে আমাদের ৬ ভাইয়ের জন্য জমি ক্রয় করেছেন। তাতেও বড় ভাইকে অন্যদের থেকে বেশি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এগুলো ওয়ারিস সম্পত্তি হিসেবে নয়, যা মৃত্যুর পর সন্তানরা পায়। এখন জানার বিষয় হল, আব্বার শুধু বড় ভাইকে নিয়ে হজ্বে যাওয়া এবং তারা স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করা ও বিষয়-সম্পত্তি বেশি দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না?

নতুন জমিতে আমাদের বোনেরা অংশিদার হবে কি না? যদি হয় তাহলে কীভাবে হবে? অনুগ্রহ করে শরয়ী সমাধান দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : আপনার পিতার জন্য আমলদার ছেলেকে সফরসঙ্গী হিসেবে হজ্বে নিয়ে যাওয়া দোষের কিছু হয়নি। বাবা তার সন্তানদের যে কাউকে ইচ্ছা নিজের সঙ্গে হজ্বে নিয়ে যেতে পারেন। এতে অন্যদের আপত্তি করার কোনো অধিকার নেই। এ নিয়ে আপত্তি করা বা বাবাকে দোষারোপ করা অন্যায়। তবে আপনার পিতা যেভাবে আপনাদের জন্য পৃথক পৃথক নামে জমি কিনেছেন তেমনিভাবে আপনাদের বোনদেরকেও জমি দেওয়া কর্তব্য ছিল। মেয়েদেরকে না দিয়ে শুধু ছেলেদের দেওয়া অন্যায় হয়েছে। অবশ্য এখনো আনুপাতিক হারে মেয়েদের জন্য আলাদা জমি কিনে দিয়ে সে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আপনার পিতার জন্য সেটিই এখন করণীয়। কারণ হাদীসে সন্তানদেরকে দান করার ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আর আপনার বড় ভাইকে যদি তার আমল-আখলাকের কারণে সম্পদ কিছু বেশি দেয়া হয়ে থাকে তবে তাতে দোষের কিছু হয়নি। বিশেষ কারণে কিছু কম-বেশি দেওয়ার অধিকার পিতার রয়েছে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৫৬; বাদায়েউস সানায়ে ৫/১৮২; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৪/৪৬২; আলবাহরুর রায়েক ৭/২৮৮; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০০; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৩৭

বিবিধ

আম্মার তাহের
উত্তরখান, ঢাকা

৪৩২০ প্রশ্ন : আমার আম্মুর হাই প্রেসার। মাথা সবসময় গরম হয়ে থাকে। তাই সর্বদা মাথায় কাপড় রাখতে কষ্ট হয়। জানতে চাচ্ছি, তিনি আমাদের সামনে এমনিভাবে অন্য মাহরাম পুরুষদের সামনে মাথা খোলা রাখতে পারবেন কি না? এবং মাথা খোলা রেখে কুরআন শরীফ ও হাদীসের কিতাব পড়তে পারবেন কি? দয়া করে জানালে উপকার হবে।

উত্তর : নারীদের জন্য মাহরাম পুরুষদের সামনে মাথা ঢেকে রাখা উত্তম। তবে খোলা রাখা জায়েয। বিশেষত অসুস্থতার ওজরে হলে অনুত্তমও নয়। আপনার আম্মা যেহেতু অসুস্থ তাই তার জন্য মাহরামদের সামনে মাথা খোলা রাখা দোষণীয় হবে না। আর একই ওজরের কারণে তিনি কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতের সময়েও মাথা খোলা রাখতে পারবেন। তবে ওজর না থাকলে মাথা ঢেকে তিলাওয়াত করা উত্তম। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ১৭৫৭; আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ৩/৩১৬; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২৯১; ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৪২৬; শরহুল মুনয়া পৃ. ৪৯৫; রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬৭ ●

Scanned by CamScanner

মুমিন প্রতারণা করেনা...

(৫পৃষ্ঠার পর)

হে খাত্তাবের বেটা! তোমরা কি এ বিষয়ে সংশয়ী?! ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তো তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে এসেছি শুভ্র-সমুজ্জ্বলরূপে। ওদেরকে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করো না। হতে পারে ওরা কোনো হক কথা বলবে কিন্তু তোমরা তা অস্বীকার করবে অথবা কোনো নাহক কথা বলবে আর তোমরা তা কবুল করবে। ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মূসা যদি জীবিত হতেন তাহলে তাঁরও আমার অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো অবকাশ থাকত না। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫১৫৬

মুসলমানকে নিজের দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ও সংবেদনশীল থাকতে হবে। 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' জাতীয় কথায় বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হওয়া মুমিনের শান নয়।

এজাতীয় দর্শনে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার নানা নজির আমাদের সামনে আছে। মনে পড়ছে আজানগাছি নামক পশ্চিমবঙ্গের এক ভদ্রলোকের কথা। তার ভক্তরা বছরে একবার প্রেসক্লাবে জমা হয়ে আন্তধর্মীয় অনুষ্ঠান করত। ওখানে সাধারণত দেখা যেত বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকে। বিভিন্ন ধর্মের লোকেরাও হয়ত কিছু থাকত। অতি সম্প্রতি ভারতেও তোলপাড় হয়ে গেল তথাকথিত সর্বধর্মীয় চেতনাবাদী গুরমিত সিংয়ের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে।

একই কাণ্ড এবার দেখা গেল ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় নেতা পোপের আগমনকে কেন্দ্র করে। শুধু খ্রিস্টানের একান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে সাধারণ অবুঝ মুসলমানদের সে মুখীই করা হয়নি বরং একটি তথাকথিত সর্বধর্মীয় প্রার্থনা-সভাও করে ফেলা হয়েছে, যাতে অংশগ্রহণ করেছেন কোনো কোনো মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিরাও। আমাদের মনে হয় না এটা পোপের কাজ; বরং এ দেশীয় কিছু অতি উৎসাহী লোক, যারা নিজেদেরকে 'অতি উদার' 'অতি অসাম্প্রদায়িক' বলে দেশে-বিদেশে যাহির করতে ইচ্ছুক, সম্ভবত তথাকথিত আন্তধর্মীয় প্রার্থনার পেছনে কলকাঠি নেড়েছেন। যার যা উদ্দেশ্যই থাকুক, মুসলমানদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

মিডিয়ার কল্যাণে এহেন ঈমান পরিপন্থী ঘটনা গোটা বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে, যার দ্বারা দেশে-বিদেশে সরল ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলিমদের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ এই কর্মটিকে আদর্শ ও অনুসরণীয় মনে করে নিজের দ্বীন-ঈমানকে হুমকির মুখেও ফেলতে পারে। কাজেই এখানেও সেই কথা বলেই শেষ করছি, যা শিরোনামে বলেছি; মুমিন যেমন অন্যের সাথে প্রতারণা করতে পারে না, তেমনি প্রতারিতও হতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করে চলার তাওফীক দান করুন– আমীন। •

জাগুক মুহাম্মাদ...

(১১ পৃষ্ঠার পর)

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেক। হতে হবে তাঁর আদর্শের বাহক। হতে হবে তাঁর দ্বীনের রক্ষক।

আজকের আরাবী মুহাম্মাদের কাছে আশেকানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দাবি থাকা খুবই সংগত যে, তার দ্বারা আরব জাহানে কোনও ভাঙচুর নয়; বরং প্রতিষ্ঠিত হবে ঐক্য ও সংহতি। সেই ঐক্য ও সংহতিতে বাকি মুসলিম জাহানকেও জুড়ে নেওয়ার পেছনে তার ভূমিকা থাকবে। সেই সম্মিলিত শক্তি ব্যবহৃত হবে বিশ্ব-মানবতার মুক্তিসংগ্রামে। সে মুক্তি মানুষের দাসত্ব থেকে, রক্ত-বর্ণের বৈষম্য থেকে, দুর্বলের প্রতি শক্তিমানের নিপীড়ন থেকে, অশিক্ষা, অপসংস্কৃতি, অধর্ম ও পাশব প্রবৃত্তি থেকে এবং সে মুক্তি সর্বপ্রকার অন্ধকার ও অশুভত্ব থেকে। নিঃসন্দেহে মানুষের সর্বপ্রকার মুক্তি আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামের অনুসরণের ভেতর নিহিত; বিশ্বব্যাপী যার প্রচার-প্রতিষ্ঠার দায়িত্বসহ পবিত্র আরবভূমিতে প্রেরিত হয়েছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের যত মুহাম্মাদ নামধারী এবং যত আশেকানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সকলেরই কর্তব্য সারাবিশ্বে ওই নামের ঝাণ্ডা ওড়ানো। ওই নামের যশঃগানে ও তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় জানমাল দেওয়া। •

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রকাশনা বিভাগ ৩০/১২, পল্লবী (মিরপুর-১২) ঢাকা-১২১৬

[লোকমুখে প্রসিদ্ধ ভিত্তিহীন বর্ণনাসমূহের উপর হাদীস শাস্ত্রের আলোকে রচিত প্রামাণ্য গ্রন্থ]

এসব হাদীস নয় -২

বহু প্রতীক্ষিত প্রচলিত জাল হাদীসের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, 'এসব হাদীস নয়-২' নামে।

এসব হাদীস নয় -১

পূর্বে প্রকাশিত 'প্রচলিত জাল হাদীস'-এর বর্ধিত, পরিমার্জিত ও উন্নত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে 'এসব হাদীস নয়-১' নামে।

সিয়াম ও রমযান ফাযায়েল ও মাসায়েল

[হাদীস ও আছারের আলোকে রমযান ও রোযার ফাযায়েল-মাসায়েল, যাকাত, সদাকাতুল ফিতর ইত্যাদি বিষয়ের এক অনন্য সংকলন।]

শীঘ্রই আসছে...

ইঞ্জিল ও প্রচলিত ইঞ্জিল

একটি পর্যালোচনা

আবু মাইসারা মুনশী মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন

هٰكَذَا فَهِمَ الصَّحَابَةُ

যেমন ছিল তাঁদের দৃষ্টি

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের উন্নত চিন্তা, দৃষ্টি, বোধ ও উপলব্ধির কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মূল-সালেহ আহমদ শামী

অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল মাজীদ

প্রকাশের পথে...

তাসাওউফের মূল তত্ত্ব

মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী

[তাসাওউফ, তাসাওউফ সংক্রান্ত শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গী, সিলসিলা, যিকির ও ওযীফা ইত্যাদির হাকীকত]

তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

[তাসাওউফের মূলতত্ত্ব, তার সঠিক পথ বহুবিধ ভ্রান্তির নিরসন, বাড়াবাড়ি-শিথিলতার সংশোধন]

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দা. বা. রচিত আরো চারটি গ্রন্থ

প্রচলিত ভুল

উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা

নির্বাচিত প্রবন্ধ ১-২

আমাদের পরিবেশক-প্রতিনিধিগণ

মাকতাবাতুল আশরাফ — মাকতাবাতুল আযহার

রাহনুমা প্রকাশনী — নাদিয়াতুল কুরআন লাইব্রেরি

আলমাহমুদ প্রকাশন — ইদরীসিয়া কুতুবখানা

মাকতাবায়ে ইলমিয়া (মিরপুর-১০) — (মাদানী নগর)

ডাকযোগে পেতে চাইলে যোগাযোগ করুন : ০১৯৭৩-২৯৫ ২৯৫

Scanned by CamScanner

শিক্ষার্থীদের পাতা

আমার মুহসিন কিতাব-৪

মাওলানা সায়্যিদ তালহা হাসানী রাহ.

[শাইখুল আদব মাওলানা ই'যায আলী রাহ. ১৩০০ হিজরী পহেলা মুহাররম ১৮৮২ ঈসাব্দ ২ নভেম্বর ভারতের উত্তর প্রদেশের বাদায়ূনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুরাদাবাদ জেলাধীন 'আমরূহা' গ্রামের অধিবাসী। বাবার কর্মসূত্রে বাদায়ূনে আসেন। এরপর চলে যান শাহজাহানপুরে। সেখানেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু।

অল্প বয়সেই তিনি কুরআন মাজীদ হিফয করেন। এরপর বাবার কর্মস্থল বদলি হওয়ার সূত্রে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। সবশেষে ভর্তি হন দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখানে শাইখুল হিন্দ রাহ.-সহ তৎকালীন বড় বড় মনীষীদের কাছে আদব, ফিক্‌হ, তাফসীর ও হাদীসের কিতাব পড়েন।

১৩২১ হিজরী ১৯০৩ ঈসাব্দে দেওবন্দ থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্ন করার পর শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর নির্দেশে ভাগলপুর জেলার 'পূরীনী'তে মাদরাসায়ে নোমানিয়ায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে প্রায় সাত বছর শিক্ষকতার পর শাহজাহানপুরে এসে 'আফযালুল মাদারেস' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই মাদরাসা পরিচালনা করেন তিন বছর।

এরপর ১৩৩০ হিজরী ১৯১২ ঈসাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৩৪০ হিজরী ১৯২১ ঈসাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা হাফেয আহমাদ সাহেবের সঙ্গে হায়দারাবাদ যান। যদিও সেখানকার প্রাদেশিক মুফতী ছিলেন হাফেয আহমাদ ছাহেব কিন্তু ফতোয়া প্রদানের যাবতীয় দায়িত্ব তিনিই আঞ্জাম দিতেন। এক বছর পর আবার দেওবন্দ ফিরে আসেন। ১৩৪৭ হিজরী ১৯২৮ ঈসাব্দে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

'তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দে'র বক্তব্য অনুযায়ী তাঁকে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয় দু'বার। প্রথমবার ১৩৪৭ হিজরী থেকে ১৩৪৮ হিজরী পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার ১৩৬৪ হিজরী থেকে ১৩৬৬ হিজরী পর্যন্ত।

দারুল উলূম দেওবন্দে তিনি চুয়াল্লিশ বছর ফিক্‌হ ও আদবের খেদমত করেন। তিনি আরবী ও উর্দূ দুই ভাষায়ই কবিতা লিখতেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার পাশাপাশি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত 'আল-কাসেম' ও 'আর-রশীদ' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন।

তাঁর রচনাবলীর মধ্যে যেমন রয়েছে মৌলিক গ্রন্থ তেমনি আছে তরজমা ও হাশিয়া। তবে গুরুত্বপূর্ণ দরসী কিতাবের হাশিয়ার খেদমতই করেছেন বেশি। যেমন, হাদীস শাস্ত্রে শামায়েলে তিরমিযী। ফিক্‌হ শাস্ত্রে নূরুল ইযাহ, মুখতাসারুল কুদূরী, শরহে নুকায়া ও কানযুদ দাকায়েক। আরবী সাহিত্যে দিওয়ানে হামাসা ও দিওয়ানে মুতানাব্বী। বালাগাত শাস্ত্রে তালখী-সুল মিফতাহ ও আরূযুল মিফতাহ। বিশেষ করে দিওয়ানে হামাসা ও দিওয়ানে মুতানাব্বীর উপর লেখা তাঁর হাশিয়া খুবই প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত। এছাড়া তাঁর মৌলিক রচনা ও সংকলনের মধ্যে রয়েছে নাফহাতুল আরব, মুফীদুত তালিবীন ও 'দুনিয়া কো ইসলাম সে কিস কিস তারাহ রুকা গিয়া' ইত্যাদি। অনুবাদ করেছেন ইবনে হাজার মাক্কী রাহ.-এর 'কিতাবুয যাওয়াজির' ও হাবীবুর রহমান উসমানী রাহ.-এর 'কাসিদায়ে লামিয়া'।

উলামায়ে দেওবন্দের নক্ষত্রতুল্য এই মনীষী ১২ রজব ১৩৭৪হিজরী/৬ মার্চ ১৯৫৫ ঈসাব্দে এই দুনিয়া ছেড়ে যান। মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। -অনুবাদক]

[হযরত মাওলানা ই'যায আলী রাহ. (১৩০০-১৩৭৪ হি.)-এর এই লেখায় বেশ কিছু ইলমী বিষয় রয়েছে। তালিবুল ইলম ভাইদের উপকৃত হবার মত বিষয়ও অনেক। তবে নেসাব সংক্রান্ত যে আলোচনা এখানে এসেছে, তা বুঝা ও তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করা বড়দের কাজ। আশা করি তালিবুল ইলম ভাইয়েরা এ লেখা থেকে কেবল নিজেদের শেখার বিষয়গুলোই নেবেন। আর যা করবেন আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শক্রমেই করবেন। -আবদুল মালেক]

নদওয়াতুল উলামা লখনৌ থেকে প্রকাশিত ইলমী পত্রিকা 'আন-নদওয়া'য় দীর্ঘদিন ধরে 'মেরী মুহসিন কিতাবেঁ' শিরোনামে দেশের প্রসিদ্ধ ও বরেণ্যদের লেখা ছাপা হচ্ছে। সেখানে তাঁরা খুব সংক্ষেপে নিজেদের শিক্ষাজীবন ও মুহসিন কিতাবের গল্প বলছেন। তাতে বিশেষ করে তলাবা ও উলামায়ে কেরাম খুবই উপকৃত হচ্ছেন। তাছাড়া এর মাধ্যমে উর্দূ সাহিত্যেও একটি চমৎকার ধারার সূচনা হচ্ছে। বর্ণনার সাবলীলতা, উপস্থাপনার মাধুর্য ও রুচির বৈচিত্র্য শিরোনামটিকে এমন আকর্ষণীয় করে তুলেছে যে, নতুন লেখা তো বটেই পুরনো লেখাগুলোও অফুরন্ত স্বাদ ও সুবাস বিলিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন সফরে আমি আহলে ইলমদেরকে মুগ্ধতার সঙ্গে লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছি।

সম্প্রতি আমাকেও এ বিষয়ে লিখতে বলা হয়েছে। আমি সে আদেশ পালন করতে চেয়েছি এবং কিছু লিখেছিও। কিন্তু প্রাথমিক দুয়েক কথা বলে যখনই নিজের প্রসঙ্গে লিখতে যাই কলম থেমে যায়। এই শিরোনামে লেখা তো তাঁদেরই সাজে যাদের উপর বহু কিতাব ইহসান করেছে এবং তাঁরাও সেই ইহসান গ্রহণ করতে পেরেছেন। অথবা এখানে তারাই লিখবেন, যারা জ্ঞানী-গুণী ও বরেণ্যদের কাছে সমাদৃত। যাদের আত্মকথা পড়ে সবাই উপকৃত হতে পারে। আমার ক্ষেত্রে তো এসবের কোনোটিই নেই। ফলে এখানে আমার লেখা হবে ওযু ছাড়া নামায পড়ার মতো। তারপরও আদেশ এবং জোর নির্দেশ– যেন কিছু না কিছু লিখি। এখন তা পালন না করে আমার কোনো উপায় নেই।

আমার বড় ভাইজান হাফেয ছিলেন। আম্মার কাছে শুনেছি, তার তিলাওয়াত খুব সুন্দর ছিল। ছোটবেলা দুষ্ট বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আম্মা আব্বাকে না জানিয়েই তিনি এলাহাবাদ চলে যান। সেখানে গিয়ে পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি হন। প্রথমে কনস্টেবল ছিলেন। পরে কয়েক বছরের মধ্যেই সাব-ইন্সপেক্টর হন। চাকুরীর জন্য যেদিন বের হয়েছেন সেদিন থেকে মনে হয় আর কুরআন মাজীদ হাতে নিয়ে দেখেননি। তাই নামাযে যেটুকু পড়া হয় এর বেশি আর তিলাওয়াত হয়নি। হাফেয সাহেবগণ বলেন, কুরআন মাজীদ মুখস্থ করা যতটা কঠিন, মুখস্থ রাখা তারচেয়ে ঢের কঠিন। তো, ভাইজান সাব-ইন্সপেক্টরের পদ পেয়েছেন, কিন্তু কুরআন মাজীদ ইয়াদ রাখতে পারেননি। বিষয়টি আম্মাকে খুব কষ্ট দিত।

আমার নানা আলেম ছিলেন না। তবে আগের দিনের মানুষদের মতো অনেক দ্বীনদার ছিলেন। আমার বড় আরো দুই ভাই আছেন। তাদের মধ্যে একজন উর্দূ

মডেল পাশ করে চাকুরীর খোঁজে গোয়ালিয়র চলে যান। আরেক ভাই আরবী পড়া শুরু করেন। তবে মীযান পর্যন্ত গিয়েই পড়া শেষ করেন। আব্বাজানের এক বন্ধু সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী সাহেবের পীড়াপীড়িতে বরং শেষ করতে বাধ্য হন। এরপর জেনারেল শিক্ষায় এন্ট্রান্স পাশ করেন।

এবার বলি নিজের কথা। কুরআন মাজীদ হিফযের উদ্দেশ্যে আম্মাজান আমাকে একজন বয়স্ক উস্তাযের নিকট পাঠান। আমিও হিফয শুরু করি। একদিনের ঘটনা, দরসে বসে পড়ছিলাম। হঠাৎ দেখি সায়্যিদ মুহাম্মাদ আলী সাহেব এসেছেন। আমি উস্তাদজীর কাছেই বসা। তিনি আমাকে দেখে বললেন, এ কার ছেলে?

উস্তাদজী বললেন, মুনশী মেযাজ আলীর। আমি জানতাম, ইনি আব্বার বন্ধু। তাই উস্তাদজীর সঙ্গে আমাকে নিয়ে কথা বলতে দেখে ভাবলাম, তিনি আমার উপর খুশি হবেন এবং আমাকে সাবাশি দিবেন। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। তিনি রেগে উঠলেন। উঁচুস্বরে বললেন, মেযাজ আলী এমন পাগলামী করল কেন! এই মাসুম বাচ্চাটাকে কুরআন হিফযে লাগিয়ে দিল!? সে কি চাচ্ছে, তার ছেলে হাফেয হয়ে গোরস্তানে গোরস্তানে কুরআন খতম করুক! এই ছেলেটাকে সে কি ফাতেহা পড়ে হালুয়া খেতে বাধ্য করতে চাচ্ছে!? আশ্চর্য পাগলামি!

আমি তখন অনেক ছোট। ভালো করে কথাও বলতে পারি না। অনেক শব্দই উচ্চারণ করতে গিয়ে তোতলামী আসে। সেজন্য সাথী সঙ্গীরা আমার তোতলামী জড়ানো শব্দগুলো নিয়ে হাসাহাসি করে। তো ঘটনা সেই ছোট বয়সের হলেও সায়্যিদ সাহেবের কথাগুলো আমার হৃদয়ে খুব রেখাপাত করেছিল। এমনকি কথাগুলো কুরআনে কারীম অবমাননার পর্যায়ের মনে হয়েছিল।

সায়্যিদ সাহেব ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন না। সম্ভবত ইংরেজির এক অক্ষরও জানতেন না। তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেন। এমনকি নামাযের সময় হলে কখনো ইংরেজ প্রশাসকের সামনে পেশ করা কাগজপত্র খোলা রেখেই মসজিদে চলে যেতেন। এছাড়া কাচারিতে সাধারণত আলেমদের মতো জুব্বা পরে যেতেন।

যাই হোক, আল্লাহর হুকুমে আমি 'হাফেযে কুরআন' নামে প্রসিদ্ধ হলাম। আনন্দের বিষয় হল– শেষ বয়সে এসে সায়্যিদ সাহেব তার ছোট ছেলেকে কুরআনের হাফেয বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! আমার জানা নেই তাঁর এই পরিবর্তন কীভাবে হয়েছিল।

সায়্যিদ সাহেব ধনী মানুষ ছিলেন। ছেলের কুরআনুল কারীম হিফযের জন্য ভালো ভালো উস্তায নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু তার আশা পূরণ হয়নি। আমার মনে হয়, সেই যে কুরআন-অবমাননাকর কথা তিনি বলেছিলেন, তা আল্লাহ পছন্দ করেননি। সেজন্যই তার ছেলে হাফেয হতে পারেনি।

হিফয শেষ করার সময় আমার বয়স কত ছিল ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু স্পষ্ট মনে আছে, কেউ কেউ আমার দিকে ইশারা করে বলত, মুনশীজী (অর্থাৎ আমার আব্বা মেযাজ আলী) গর্ব করার জন্য ছেলেকে হাফেয নামে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে। এত কম বয়সে একটা শিশু হাফেয হয় কীভাবে!

অবশ্য তাদের এসব কথা একেবারে ভুলও ছিল না। কারণ, আমার হিফযের অবস্থা এমন ছিল, প্রথমবার তারাবী পড়ানোর কষ্টের কথা এখনো মনে পড়ে। সে রমযানে সাহরী থেকে ফারেগ হয়ে কুরআন মাজীদ নিয়ে বসতাম। এরপর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তো অবশ্যই উঠতাম। এছাড়া সারাক্ষণ সেখানেই বসে থাকতাম, পারা ইয়াদ করতাম। এমনকি নামাযের সময়ও উঠতাম না। ওখানেই নামায পড়তাম। অর্থাৎ শেষরাত থেকে ইয়াদ করা শুরু করতাম, একেবারে তারাবীহর আগ পর্যন্ত পড়ে সেখান থেকে উঠে সোজা মসজিদে চলে যেতাম। এই সময়ের মধ্যে ইয়াদ করতাম কেবল সোয়া পারা। সেটাও বহু কষ্টে! এজন্য কেউ আমার হাফেয হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে সেটা একেবারে অমূলক হত না।

এভাবে ছাব্বিশ রমযান দিবাগত রাতে যখন আমাদের খতম হল, তখন তো আম্মা-আব্বার খুশির কোনো সীমা ছিল না। বড় ভাইও অনেক খুশি হয়েছিলেন। সে রাতে আমার এত আরামের ঘুম হয়েছিল যে, সাহরীর সময় খুব কষ্ট করে ওঠাতে হয়েছিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মকতবে গেলাম। ভাবছিলাম, আজ সাথী-সঙ্গীরা এবং খোদ উস্তাদজীও আমার প্রশংসা করবেন। (অবশ্য হাফেয ছাহেব হুযুর আমার সামনে কোনোদিন প্রশংসা করেছেন বলে মনে পড়ছে না।) মকতবে হাজির হতেই এক ছাত্র টিপ্পনী কেটে বলল, 'ছাব্বিশ দিন পর আজ ঘরের জেলখানা থেকে ওর মুক্তি মিলেছে রে!'

আর উস্তাদজী তাঁর স্বভাবসুলভ সরলতা নিয়ে বললেন, 'কুরআনের অর্থ না বুঝতে পারলে শুধু হিফয করে কী লাভ?! কুরআনের অর্থ বুঝতে হলে তো আরবী জানতে হবে।'

উস্তাদজীর কারামাতই বলা যায় অথবা হতে পারে আল্লাহ তাআলার কুদরতের কোনো কারিশমা, তখনই আমি আরবী শেখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি। এ থেকে স্পষ্ট হয়, আমার আরবী পড়ার মূল প্রেরণাও ছিল এই কুরআন মাজীদ। এভাবেই আমার জীবন শুরু হয়েছে।

এরপর হাফেয সাহেবই আমাকে ফার্সী কিতাব 'আমাদনামা' পড়ানো শুরু করেন। তিনি মোটামুটি ফার্সী জানতেন। গুলিস্তা পড়ানোর সময় উর্দূ তরজমার সাহায্য নিতেন।

এরই মধ্যে আব্বাজান 'তিলহরে' বদলি হয়ে যান। আমাকে ওখানকার 'মাদরাসায়ে গুলশানে ফয়েয'-এ ভর্তি করে দেন। এ মাদরাসায় ছাত্র ছিল অর্ধশতাধিক। সকলেই মাসিক অযীফা দিত। এছাড়া বাইরে থেকে প্রতি মাসে সম্ভবত আট রুপি করে আর্থিক ইআনাত আসত। এভাবেই ছোট্ট পরিসরে মাদরাসার কার্যক্রম চলত।

মাদরাসায় মৌলভী মাকসূদ আলী খান নামে একজন উস্তায ছিলেন। সরফ ও নাহব শাস্ত্রে ছিলেন খুব দক্ষ। তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল কিছুটা প্রাচীন ধারার। ষাট-সত্তর বছর আগে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে যে ধারার পাঠদান পদ্ধতি ছিল কিছুটা সেরকম। সেজন্য মীযান তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করতে হয়েছে। মুখস্থও ছিল একেবারে শব্দে শব্দে। মুনশাইবের 'বাব' এবং 'সরফে সগীর'ও মুখস্থ ছিল। 'যুবদা'ও মুখস্থ ছিল হুবহু। নাহবেমীর এবং কাফিয়ার শেষ কয়েক পৃষ্ঠা ছাড়া পুরো কিতাব মুখস্থ ছিল। আর এসব বিষয়ের প্রতি ধ্যান ও মনযোগ তখন এত বেশি ছিল যে, অধিকাংশ সময় ঘুমের মধ্যে কুরআন মাজীদের পরিবর্তে মীযান নাহবেমীরের বাক্য মুখ দিয়ে বের হত!

এখানে আমি গুলিস্তা কিতাবও নতুন করে শুরু করি। এখানের ছাত্ররা ফার্সী ভাষার অনেক নিয়ম-কানুন মুখস্থ করার পর গুলিস্তা পড়ার সুযোগ পেত। ফলে 'কাওয়ায়েদ' পড়ার পর আল্লাহর মেহেরবানীতে গুলিস্তা আমার কাছে আর কঠিন মনে হয়নি।

এরই মধ্যে আব্বাজান চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আমরা আবার শাহজাহানপুর চলে আসি। তখন এমন একজনকে আমার পড়াশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়, যিনি মোটামুটি আরবী জানতেন। তাই এ কয়েক বছর আমার আরবীর তেমন উন্নতি হয়নি; বলতে গেলে এ কয়েক বছর আমার সময়গুলো তেমন একটা কাজে লাগেনি। তবে আল্লাহর শোকর, সময় নষ্ট হওয়ার অনুভূতি আমার ছিল, এজন্য আমি পেরেশানও ছিলাম। একসময় আল্লাহর মেহেরবানী হল। আমি আব্বাকে বললাম, আমার তো ফার্সী অনেকগুলো কিতাব এখনো পড়া হয়নি।

Scanned by CamScanner

এখন যাঁর কাছে পড়ছি তিনি খুব ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া তাঁর হয়ত সেগুলো পড়ানোর সুযোগও হবে না। তাই আমাকে 'সেকান্দারনামা' পড়ার অনুমতি দিন এবং শাহজাহানপুরে 'মাদরাসা আইনুল উলূম'-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিন। আল্লাহর মেহেরবানীতে অনুমতি হয়ে গেল।

মাদরাসায় গিয়ে দেখি সেখানের উস্তাযগণও খুব ব্যস্ত। কারো কাছ থেকে সময় নেওয়ার মতো অবস্থা নেই। এক পর্যায়ে আমার আগ্রহ ও মেহনত দেখে দিল্লীর আমীনীয়া মাদরাসার মুহতামিম মুফতী কিফায়াতুল্লাহ ছাহেবের দয়া হল। তিনি আমাকে 'সেকান্দারনামা' পড়ানোর জন্য আধা ঘণ্টা সময় দিলেন। আমি সেটুকুতেই অনেক খুশি হলাম এবং তাকে গনীমত মনে করলাম।

কয়েক মাস পর আসাতেযায়ে কেরাম মেহেরবানী করে আমাকে একটি জামাতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সেখানে দুইজন উস্তাযের তত্ত্বাবধানে দৈনিক ছয়টি করে দরস হত। সেখানে আরবী কিতাবও পড়া শুরু হল। উস্তাযগণের মেহনত ও তত্ত্বাবধান ছিল এত সুন্দর যে, ইলম হাসিল করতে গিয়ে যে ধরনের কষ্ট হয় তার কিছুই আমরা অনুভব করিনি। দরসে ও দরসের বাইরে যখন যা জিজ্ঞেস করার দরকার হত জিজ্ঞেস করতে পারতাম। মাদরাসায় তো বটেই, বাসায় গিয়েও জিজ্ঞেস করতে পারতাম। হযরত মাওলানা সায়্যিদ বশীর আহমদ মুরাদাবাদী রাহ.-কে তো বহুবার ঘুম থেকে জাগিয়ে কিতাব 'হল' করেছি। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে রহমতের নূর দিয়ে ভরে দিন। আশ্চর্যের বিষয় হল, এজাতীয় আচরণে না আমাদের কোনো সংকোচ ছিল, না তিনি বিরক্ত হতেন।

এছাড়াও মুফতী কিফায়াতুল্লাহ ছাহেব দুপুরের বিশ্রাম বাদ দিয়ে আমাকে শরহে বেকায়া পড়িয়েছেন। মেহেরবান আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উত্তম থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সেই দিনগুলোতে আমার জন্য মনে রাখার মত আরেকটি বিষয় ছিল– আমাদের বাড়ির পাশের বাজারে এক আর্য লোকের আতরের দোকান ছিল। তার বয়স ষাটের কম হবে না। তার দোকানে গেলেই তিনি নানা ধরণের প্রশ্ন করতেন। বিশেষ করে ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তার প্রশ্ন হত বেশি। আমার সেসব প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকায় উস্তাযগণের কাছে ছুটে যেতাম এবং জবাব জেনে নিতাম।

ওদিকে কুরআনের 'ফাসাহাত বালাগাত'-এর বিষয়টি আমার কাছে অস্পষ্ট একটি বিষয়ে পরিণত হল। কেবলই মনে হত, কুরআনে নাহু-ছরফ ছাড়াও অন্য অনেক বিষয় আছে।

এই অবস্থায় দারুল উলূম দেওবন্দে যাই। কিছুদিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি পড়া শেষ হলে শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর কাছে তাফসীরে বাইযাবী পড়া শুরু হয়। সূরা বাকারার প্রথমেই রয়েছে 'হুরুফুল মুকাত্তাআত'-এর আলোচনা। শাইখুল হিন্দ রাহ.-এর তাকরীর এখন আর মনে নেই। এছাড়া সেই তাকরীর বোঝার যোগ্যতাও তো আমার নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে, কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আমার যেসব ভুল ধারণা ছিল প্রতিদিনের দরসে সেগুলো দূর হতে থাকে।

আমার পুরো আলোচনা থেকে সম্ভবত এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে, আমার 'ইলমে যাহিরী'র অসীলা যেমন ছিল কুরআন মাজীদ তেমনি আকীদা শুদ্ধতার অসীলাও ছিল এই কুরআন মাজীদ।

দারুল উলূম দেওবন্দে আমি যখন নূরুল আনওয়ার পড়ছি তখন দাওরায়ে হাদীসের এক ছাত্র আমাকে মাকামাতে হারীরী পড়াতেন। তার পাঠদান আমার মধ্যে আরবী ভাষার প্রতি মহব্বত তৈরি করে। একসময় আরবী সাহিত্যের মহত্ত্ব এমনভাবে মনে গেঁথে যায়, যার অসীলায় ভালো ধারণা পোষণকারীরা আমাকে 'আদীব' বলে। আর আমি আপন মনে বলি–

لو صاحب آفتاب کہاں اور ہم کہاں
احمق بنیں ہم اس کو نہ سمجھیں اگر غلط

হায় সাহেব! কোথায় সূর্য আর কোথায় আমরা?/বড় আহমক বনে যাব যদি এই ভুল ধরতে না পারি।

আগেই বলেছি, আমার সরফ ও নাহবের উস্তাদজী আগের কালে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের শিক্ষকদের ধারায় পড়াতেন। ফলে জটিল থেকে জটিল সীগাগুলোর তালীল, কঠিন ও পেঁচানো ইবারতগুলোর তারকীব ইত্যাদি খুব গুরুত্বের সঙ্গে করতে হত। এজন্য আমি শরহে জামী সমাপ্ত করার আগে নাহব বিষয়ে দরসে নেযামীর কয়েকটি কিতাব ছাড়া আর কোনো কিতাব মুতালাআ করার সুযোগ পাইনি।

দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর শাইখুল হিন্দ রাহ. আমাকে ভাগলপুর জেলার 'পূরীনী' অঞ্চলে অবস্থিত মাদরাসায়ে নোমানিয়াতে আরবী সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করতে বলেন। সেখানে কিছু সুযোগ পাওয়ায় দরসের বাইরের অনেক কিতাব মুতালাআ করি। সেসময় মুফাসসাল, আওযাহুল মাসালিক, শরহে ইবনে আকীল ইত্যাদিও মুতালাআয় ছিল। যামাখশরী রাহ.-এর ইলমী ব্যক্তিত্বের দাবি তো হল, তাঁর কিতাব 'মুফাসসাল'-এর নাম উল্লেখ করার পর আর কোনো কিতাবের নাম উল্লেখ না করা। কিন্তু এখানে তো আমাকে বলতে হচ্ছে মুহসিন কিতাবের কথা। বলতে হচ্ছে, কোন্ কিতাবের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয়েছে বেশি– তার কথা।

ফায়দা লাভের দিক থেকে আমি 'আওযাহুল মাসালিক'কে 'মুফাসসাল' থেকে বেশি মুফীদ মনে করি। এরপর যখন 'ইবনে আকীল' মুতালাআ করেছি তখন তার প্রতি আমার মহব্বত বেশি হয়েছে। কিতাবটি আমি বারবার পড়েছি এবং চেয়েছি, তালিবুল ইলমরাও এই কিতাব পড়ুক। কিন্তু মাদরাসায়ে নোমানিয়া ছিল এমন এক কমিটির অধীন, যার অনুমতি ছাড়া এই চাওয়ার বাস্তবায়ন ছিল নীতিবহির্ভূত। এজন্য সেই কিতাব পড়ানোর ইচ্ছা আর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

দারুল উলূম দেওবন্দে যখন এলাম তখন আমার বড় ছেলেকে পড়াতে হচ্ছে। সেই সূত্রে এক জামাতকে 'শরহে ইবনে আকীল' পড়ালাম। আমার ধারণা, তাতে ওদের অনেক ফায়দা হয়েছে। এভাবে মাদরাসার নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কয়েকবার কিতাবটি পড়িয়েছি। লেখক 'ইবনে আকীলে'র ইখলাসের বরকতে যেই কিতাবটি পড়েছে তার ভক্ত হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বলি কিছুদিন ধরে আমাদের এখানে বোম্বের এক সাথী থাকেন। তিনি প্রথমে এমএ পাশ করেছেন। এখন দারুল উলূম দেওবন্দের ফারেগ এক মাওলানার কাছে মাদরাসার কিতাবাদি পড়েন। আমার কাছ থেকেও লেখাপড়ার বিষয়ে পরামর্শ নেন। তিনি মীযানুস সরফ থেকে শরহে ইবনে আকীল পর্যন্ত পড়েছেন। সেদিন তিনি বললেন, আমার কাছে শরহে ইবনে আকীলের প্রতিটি শব্দই খুব ভালো লাগে।

সংক্ষেপ কথা হলো, দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত আমার কাছে বর্ণনার সরলতা, শাস্ত্রীয় কায়দা-কানুন ও উপস্থাপনার সৌন্দর্যের বিচারে এই কিতাবের কোনো তুলনা ছিল না। কিন্তু যখন দারুল উলূম দেওবন্দে এলাম তখন কাশ্মিরী রাহ.-এর নির্দেশনায়

সিবাওয়াইহ্‌র 'আল-কিতাব' মুতালাআ করি। ইতিমধ্যে সেটি চারবার মুতালাআ করা হয়েছে। এখন মনে হয়, বরং আমার বিশ্বাস– সীবাওয়াইহ্‌র এই কিতাবই একজন তালিবুল ইলমের সামনে নাহবের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মোচিত করে দিতে পারে। এরপর তালিবুল ইলম সেখান থেকে যোগ্যতা অনুযায়ী যত ইচ্ছা হাসিল করতে পারে। কিতাবটি দরসে পড়ানোর দ্বারা হয়ত তেমন ফায়দা হবে না বরং ক্ষতিই হবে। কিন্তু এটা হয়ত অনুচিত হবে না,

Scanned by CamScanner

কোনো তালিবুল ইলম কাফিয়া বা এজাতীয় কিতাব বোঝার যোগ্য হয়ে গেলে এ কিতবাটি তার মুতালাআয় থাকবে। এমনকি কাফিয়ার স্থলে শরহে ইবনে আকীলও রাখা যেতে পারে। নেসাব বিষয়ে আমার স্বতন্ত্র কিছু নিবেদন আছে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দিলে শীঘ্রই সেগুলো আন-নদওয়ার আহলে ইলম পাঠকদের খেদমতে পেশ করব। তাতে ভালো কিছু থাকলে তারা গ্রহণ করবেন। অন্যথায় পরিহার করবেন।

আরবী সাহিত্য নিয়ে কিছু কথা বলি। মনপূত না হলে আশা করি আমাকে 'মাযূর' ধরে নেবেন। কারণ, হতে পারে–

معشوق من ست آں کہ بہ نزدیک تو زشت است

আমার প্রেমাস্পদ তো সে-ই যে তোমার কাছে অপছন্দনীয়।

এ যুগের উলামায়ে কেরাম মাকামাতে হারীরী পছন্দ করেন না। আসাম প্রদেশে সরকারি মাদরাসাগুলোতে পরীক্ষক হিসেবে গিয়ে জানতে পেরেছি, সেখানে এই মযলূম কিতাবের কেবল পাঁচ মাকামা নেসাবে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন তৈরি করার সময় আমার অবাক লাগত, এ কয় পৃষ্ঠা নেসাবে রাখারইবা কী প্রয়োজন! বরকত হাসিলই উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে তালিবুল ইলমদেরকে কিতাবটি একবার যিয়ারত করিয়ে দিলেই হয়!

এখানেই শেষ নয়। কেউ কেউ নাকি শালীনতার সীমা অতিক্রম করে এই কিতাব ও কিতাবের লেখক সম্পর্কে মন্দ শব্দ ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেন না। আমি মাকামাতে হারীরীর খুব প্রশংসা করি। মনে করি, শব্দভাণ্ডার, শব্দের ব্যবহার, 'ইলমে বদী'র শৈলী ও হাকীকত এই কিতাবের মাধ্যমে যেমন স্পষ্ট হয় অন্য কোনো কিতাবের মাধ্যমে তা হয় না। এক কথায় এই কিতাবের সমকক্ষ কোনো কিতাব আমি দেখি না।

যাইহোক, দরসে কমপক্ষে পঁচিশ মাকামা পড়ানো উচিত। সেইসাথে 'তারীখে ইয়ামানী'র উল্লেখযোগ্য একটা অংশও রাখা যেতে পারে।

এবার 'দিওয়ান' সম্পর্কে বলি, মুতাআখখিরীনের দিওয়ানের মধ্যে খুব আগ্রহের সঙ্গে কয়েকবার পড়েছি 'দিওয়ানে বুহতুরী'। কিন্তু সাধারণভাবে জাহিলী যুগের কবিদের কথায় যে আকর্ষণ ও সাবলীলতা আছে পরবর্তীদের মধ্যে আমি সেসব গুণ দেখতে পাই না। জাহিলী যুগের কবিদের মধ্যে ইমরুউল কায়েসের কবিতা আমার বেশি পছন্দ। পরবর্তীদের মধ্যে 'মাআররী'র 'সাকতুয যানদ' ও তার শরহ 'তানভীর' এবং ইবনে ফারেযের কবিতা এখনো আমার শিথানের পাশে থাকে। আমি এইসব কবিদের কবিতা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি।

সাহিত্যের জন্য আমার মনে হয় যে পরিমাণ নাহব ও সরফ জরুরি ঠিক সেই পরিমাণ জরুরি 'ইলমে মাআনী' ও 'ইলমে বয়ান'। ইলমে মাআনীর বিভিন্ন পরিভাষা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভের জন্য 'মুখতাসারুল মাআনী' খুব জরুরি। এরপর 'দালাইলুল ই'জায' কিংবা 'মুতাওয়াল' পড়ে নিলেই যথেষ্ট।

আমার ব্যক্তিগত মতামত হল, তালিবুল ইলমদেরকে প্রথমে সহজ ও সংক্ষেপে শাস্ত্র ও শাস্ত্রের পরিভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত।

আর আসাতিযায়ে কেরাম খুব হেকমতের সঙ্গে তালিবুল ইলমদের মধ্যে এমন যোগ্যতা তৈরি করে দেবেন যেন তারা খুব আগ্রহ নিয়ে মাদরাসায় আসে, মাদরাসা ও জেলখানার পার্থক্য পরিষ্কার বুঝতে পারে। দরসের সময়গুলো যেন জেলবন্দির মতো না কাটে।

তালিবুল ইলমদের মধ্যে যখন শব্দের অর্থ ও মর্ম বোঝার যোগ্যতা তৈরি হবে তখন তাদেরকে ভাষাবিদদের কিছু উপস্থাপন শৈলী বুঝিয়ে 'মুখতারুস সিহাহ' ও এজাতীয় কোনো কিতাব পড়িয়ে দেবেন। তাদের মধ্যে আরবী বোঝার যোগ্যতা তৈরী হয়ে গেলে 'মুনতাহাল আরীব' এরপর 'লিসানুল আরব' থেকে উপকৃত হবার পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন।

'আকরাবুল মাওয়ারিদ' কিতাবটি অনেক সহজ হওয়া সত্ত্বেও তাতে আমার অনেক আপত্তি আছে। 'মুনজিদ'ও নতুন শব্দের জন্য এক পর্যায়ে উপকারী মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন আরবী, বিশেষ করে তাফসীর ও হাদীসের ক্ষেত্রে এর দ্বারা উপকৃত হওয়া বিষ মেশানো মধু থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক মুহতামিম হযরাতুল উস্তায মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ রাহ. যখন হায়দারাবাদ দক্ষিণের উচ্চ আদালতে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বে নিযুক্ত হলেন তখন অধমও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তখনই আমার প্রথম ফতোয়া লেখার সুযোগ হয়। সেসময় 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' ও 'আল-হুজাজুল ওয়াযিহা ফিল বায়্যিনাতিল রাজিহা' থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। তাই আজও সেই মুসান্নিফদের জন্য দুআ করি।

'মাজাল্লা' তো এখনো আমার কাছে আছে। তা দুর্লভ কোনো কিতাবও নয়। শুনেছি এক খ্রিস্টান তার ব্যাখ্যাও লিখেছে। সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থের উদ্ধৃতিও এখন প্রচুর পাওয়া যায়। তবে 'আল-হুজাজুল ওয়াযিহা', যাকে ফিকহের বিশ্বকোষ বললেও অত্যুক্তি হবে না– খুবই দুর্লভ। কিতাবদুটির বিষয়বস্তু হল মুআমালা ও লেনদেন। ব্যাপক জানার জন্য হয়ত এ দু কিতাবের সহযোগিতা যথেষ্ট নয়। তবে 'কাযা' বা বিচার সংক্রান্ত মাসায়েল খুব সহজেই এখানে পাওয়া যায়। ব্যাপকভাবে জানার জন্য আমার ধারণায় 'বাদায়েউস সানায়ে' খুবই চমৎকার।

শরহে বেকায়ার কথা এখানে উল্লেখ না করলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ, সেটি পড়ার পর বারবার পড়ানোরও সুযোগ হয়েছে। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুন তা থেকে খুব বেশি উপকৃত হতে পারিনি।

শরহে নুকায়া নামে দুটি কিতাব আছে। একটি মোল্লা আলী কারী রহ.-এর। আরেকটি শুমুন্নী রহ.-এর। দ্বিতীয়টির হাতে লেখা নুসখা তো দারুল উলূম দেওবন্দের কুতুবখানায় আছে। প্রথমটি ছেপেছে 'কাযান' থেকে। হিন্দুস্তানের কয়েক জায়গায় এর বিভিন্ন নুসখা দেখেছি। তবে সম্ভবত সবগুলোই কাযান থেকে ছাপা নুসখা থেকেই নকল করা। কারণ, বড় বড় ভুলের ক্ষেত্রে আসল নকল সবগুলোই বরাবর। একটি নুসখা আমার কাছেও আছে। মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। সেটিও কাযানের ছাপা। হিন্দুস্তানে কেবল কিতাবুল হজ পর্যন্ত এক খণ্ডে ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুল ওয়াকফ পর্যন্ত মুদ্রণাধীন রয়েছে।

শরহুন নুকায়ার এই নুসখা সম্পর্কে আমার প্রশংসা যদিও অজ্ঞের প্রশংসা। তবে কিতাবটিকে মোল্লা আলী কারী রাহ.-এর ইলমী বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন মনে করা হয়। তাকলীদের যে ভুল অর্থ বর্তমান হিন্দুস্তানে প্রচারিত, এই কিতাবের মাধ্যমে তা দূর হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আরেকটি কথা বলি, আমার মতে একেবারে শৈশব থেকেই বাচ্চাদেরকে আখলাক ও তাসাওউফের প্রতি আগ্রহী করা উচিত। তবে আমলীভাবে। কিতাব পাঠদানের মাধ্যমে নয়। আর চেষ্টা করা উচিত, যেন তার দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষারও উন্নতি হতে থাকে।

নিকটতম সময়ের মধ্যে যেহেতু নেসাব সংস্কার বিষয়ে কিছু লিখতে হবে তাই শুধু এটুকু বলেই সমাপ্ত করছি, ইমাম নববী রহ.-এর 'রিয়াযুস সালেহীন' নেসাবভুক্ত করা সম্ভব না হলে কমপক্ষে মাধ্যমিক স্তরের তালিবুল ইলমদের জন্য কিতাবটি অনানুষ্ঠানিক পাঠ্য করা যেতে পারে। আর যারা দরসী কিতাবাদি মোটামুটি বুঝে, দরসে অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্রগুলো সম্পর্কেও যথেষ্ট জানে তাদের জন্য ইমাম গাযালী রহ.-এর রচনাবলী মুতালাআ করাও আমি উপকারী মনে করি। •

ভাষান্তর : তাওহীদুল ইসলাম তায়্যিব

Scanned by CamScanner

আলকাউসার শিশু কিশোর

নবীজীর দস্তরখানে

আবু আহমাদ

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

২৫. দস্তরখানে খাব

আমরা জেনেছি, খাবার পড়ে গেলে তুলে খাওয়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত। এ সুন্নত আদায়ের জন্য আরেকটি সহায়ক আদব হল দস্তরখান। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

مَا أَكَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ، وَلاَ فِي سُكُرُّجَةٍ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، قُلْتُ لِقَتَادَةَ : عَلاَمَ يَأْكُلُونَ؟ قَالَ : عَلَى السُّفَرِ.

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো 'খিওয়ান'-এর উপর (টেবিল বা টেবিলের মত উঁচু কিছুতে) খাবার রেখে খাননি এবং 'সুকরুজা'তেও (ছোট ছোট পাত্রবিশেষ) নয়। তাঁর জন্য কখনো পাতলা রুটিও তৈরি করা হয়নি। (কাতাদা থেকে বর্ণনাকারী) ইউনুস কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তাঁরা কীসের উপর খেতেন? তিনি বললেন, 'সুফরা'র উপর। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৪১৫

সে যুগে 'সুফরা' ছিল চামড়ার। তাতে আংটা থাকত। খুলে বিছালে দস্তরখান, গুটিয়ে ফেললে সফরের পাথেয় রাখার মত ছোট ব্যাগ। 'সুফরা'তে সাধারণত শুকনা খাবার রেখে খাওয়া হত। এই ধরনের দস্তরখান না হোক অন্য কোনো ধরনের দস্তরখান হলেও ব্যবহার করার চেষ্টা করব।

আমি যদি দস্তরখান ছাড়া খাই তাহলে খাবার নিচে পড়ে ময়লা লেগে যাবে; তা আবার পরিষ্কার করে তারপর খেতে হবে। কিন্তু যদি দস্তরখান বিছিয়ে নেই তাহলে দস্তরখান থেকে তুলেই খেতে পারব। তেমনি শুকনো খাবার দস্তরখানে রাখাও যাবে।

আর মনে রাখতে হবে, দস্তরখান যেন হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দস্তরখান কখনোই নোংড়া করে রাখব না। অনেককে দেখা যায়, দস্তরখানে কাঁটা, হাড্ডি ইত্যাদি ফেলে। দস্তরখান তো এগুলো ফেলার জন্য নয়। এগুলো ফেলার জন্য আলাদা কোনো পাত্র থাকলে ভালো হয়। সুতরাং আমরা দস্তরখানে কাঁটা, হাড্ডি ইত্যাদি ফেলব না। তেমনি দস্তরখান ময়লা করেও রাখব না। সাথে সাথে খেয়াল রাখব কাঁটা বা হাড্ডি পানির মধ্যে ফেলব না। কারণ তা আরেক প্রাণীর খাবার।

আরেকটি বিষয়। হাত ধোয়ার পাত্র বিশেষ করে চিলমৃচি কখনো দস্তরখানের উপর না রাখার চেষ্টা করব। কোনো কোনো বুযুর্গ এই পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে বিষয়টি জরুরি তা হল, চিলমৃচি সবসময় পরিষ্কার রাখা। হাত ধোওয়ার পর চিলমৃচি দৃষ্টির আড়ালে রাখলে ভালো। আর হাত ধোওয়ার আমল দস্তরখানে খাবার পরিবেশন করার আগে সেরে ফেললে ভালো। যাতে বেখেয়ালীতে হাত ধোওয়ার সময় খাবার পাত্রে পানির ছিটা না পড়ে।

মোটকথা, আমি দস্তরখানে খাব; টেবিলে নয়। কারণ নবীজী কখনো টেবিলে খাননি। হাঁ, কোনো সময় যদি এমন অবস্থা বা পরিবেশ হয়, টেবিলে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই তখন টেবিলে খেতে পারি। টেবিলে খাওয়া অনুত্তম হলেও নাজায়েয নয়। তবে টেবিলে খাওয়াকেই অভ্যাসে পরিণত করব না। ওযর হলে ভিন্ন বিষয়।

২৬. নিচে বসে খাব

হাদীস শরীফে এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যমিনের উপর বসতেন এবং নিচে বসে খেতেন। –শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৭৮৪৩; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১২৪৯৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৪২২২

এখানে নিচে বসে খাওয়ার একটি অর্থ– সমতল স্থানে খাওয়া। অর্থাৎ যেখানে বসা হয়েছে পাত্র (তার চেয়ে উঁচু কিছুতে না রেখে) সেখানেই রেখে খাওয়া। যেমন কেউ যদি চকি বা খাটে বসে খান এবং খাটের উপরই পাত্র রাখেন তাহলে সেটাও নিচে বসে খাওয়ার মধ্যে গণ্য হবে।

২৭. খাওয়ার সময় হেলান দিয়ে বা টেক লাগিয়ে বসব না

স্বাভাবিকভাবে বসে খাব; হেলান দিয়ে বা টেক লাগিয়ে নয়। এটি খাওয়ার একটি আদব। আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا

আমি টেক লাগিয়ে বা হেলান দিয়ে বসে খাই না। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৯৮

তো এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম, নবীজী হেলান দিয়ে বা টেক লাগিয়ে বসে খেতেন না। সুতরাং আমরাও এভাবে বসে খাব না। কারণ, পরিমাণ মত খাওয়া এবং বিনয়ের সাথে বসে খাওয়া সুন্নত। আর টেক লাগিয়ে বা হেলান দিয়ে বসলে খাওয়া বেশি হয় এবং তাতে বিনয় প্রকাশ পায় কম। তবে কারো ওজর থাকলে ভিন্ন কথা।

২৮. খাওয়ার সময় কীভাবে বসব?

খাবার আল্লাহ তাআলার বড় নিআমত। এ নিআমত গ্রহণের সময় আমরা বিনয়ের সাথে গ্রহণ করব, কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করব। আল্লাহ রিযিকদাতা আর আমরা রিযিক গ্রহণকারী। আল্লাহ আমাদের রব আর আমরা আল্লাহর বান্দা–আল্লাহর গোলাম। সুতরাং মনিবের সামনে গোলাম যেভাবে বসে, খাবার গ্রহণ করার সময় আমরা সেভাবেই বসব। বিনয় প্রকাশ পায় এমনভাবে বসব। এমনটিই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা। নবীজী বলতেন–

آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.

গোলাম যেভাবে খায় আমিও সেভাবে খাব। গোলাম যেভাবে বসে (খাওয়ার সময়) আমিও সেভাবেই বসব। –মুসনাদে

Scanned by CamScanner

আবু ইয়া'লা, হাদীস ৪৯২০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৪২১০; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫৫৭২

২৯. উপুড় হয়ে শুয়ে খাব না

অনেককে উপুড় হয়ে শুয়ে খেতে দেখা যায়। এভাবে খাওয়া ঠিক নয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপুড় হয়ে খেতে নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে তা স্বাস্থ্যসম্মতও নয়। হাদীস শরীফে এসেছে—

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপুড় হয়ে খেতে নিষেধ করেছেন। —সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৩৭০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৭৪

সুতরাং আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে খাব না।

আমাদের রাজ্য শাসন-২২

মাওলানা আবদুস সালাম কিদওয়ায়ী

হযরত আলী রা.-এর শাহাদত

নাহরাওয়ান যুদ্ধে খারেজিরা পুরোপুরি পর্যুদস্ত হয়। এর মধ্য দিয়ে খারেজী সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটে। অবশ্য এদের কিছু অনুসারী তখনও বাকি ছিল। পরবর্তীতে এদের তিনজন একত্র হয়ে নতুন ষড়যন্ত্র আঁটে। হযরত আলী রা., হযরত মুআবিয়া রা. ও হযরত আমর ইবনুল আস রা.-কে হত্যার ছক এঁকে নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে আক্রমণের প্রতিজ্ঞা করে বসে।

৪০ হিজরীর ১৫ রমযান ফজর আদায়ের জন্য হযরত আলী রা. মসজিদে যাচ্ছিলেন। মসজিদে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আবদুর রহমান ইবনে মুলযিম খারেজী মাথায় আঘাত করে। আঘাত এত গুরুতর ছিল যে, তিনি আর প্রাণে বাঁচতে পারলেন না। তৃতীয় দিন ১৭ রমযান তাঁর ইন্তেকাল হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

একই সময়ে দামেশকের মসজিদে হযরত আমীরে মুআবিয়া রা-এর উপরও আক্রমণ হয়। কিন্তু তিনি আঘাত প্রতিহত করতে সমর্থ হন এবং প্রাণে বেঁচে যান। অন্যদিকে হযরত আমর ইবনুল আস রা. ঘটনাক্রমে সেদিন মসজিদে যাননি। তাঁর পরিবর্তে অন্য একজন নামায পড়াতে গেলে তাদের সন্দেহবশত আক্রমণে তার মৃত্যু হয়।

হযরত আলী রা. খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পরপরই চারদিকে চরম বিরোধ-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে মুসলমানদের সেবা করার তেমন সুযোগই তাঁর হয়ে ওঠেনি। তারপরও হযরত উসমান রা.-এর যুগে উমাইয়া গোত্রের লোকেরা যে অনাচার ও বিশৃঙ্খলা করেছিল তিনি তা কিছুটা হলেও কমাতে সমর্থ হন।

হযরত আলী রা. সকল প্রশাসক ও দায়িত্বশীলদের সার্বক্ষণিক নজরদারি করতেন; যেন তারা সীমালঙ্ঘন করতে না পারে। আর প্রজাদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল খুবই অমায়িক। জ্ঞান-গরিমায় তিনি ছিলেন নিজ সাথী-সঙ্গীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বিচার-সালিশে তাঁর কোনো তুলনা হয় না। বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ রায় তিনি প্রদান করেছেন। ভাষণ-বক্তৃতায় তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। তাঁর মতো বক্তা তখন খুঁজে পাওয়া যেত না।

হযরত আলী রা. ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগোযার ও দুনিয়াবিমুখ খলীফা। তিনি খুবই সাদাসিধা ও সাধারণ জীবন যাপন করতেন। শুকনো খাবার খেতেন। মোটা কাপড় পরতেন। আসলে তিনি এত দানশীল ছিলেন যে, টাকা-পয়সা তাঁর হাতে থাকতই না। একদিক থেকে এলে তা অন্যদিকে দান করে দিতেন। কোনো অসহায়-অভাবী তাঁর কাছে নিরাশ হত না; খালি হাতে ফিরত না। কখনো তো এমন হত যে, ঘরের সব খাবার ফকীরকে দিয়ে নিজেরা উপোস থাকতেন। তিনি স্বভাবগতভাবেই খুবই সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। নিজের জুতাটাও নিজ হাতে সেলাই করে নিতেন।

হযরত হাসান রা.

হযরত আলী রা.-এর ইন্তেকালের পর ইরাকের জনগণ তাঁর বড় পুত্র, নবীজীর কলিজার টুকরা হযরত হাসান রা.-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। হযরত হাসান রা. অত্যন্ত ভালো ও নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল তাঁর খুবই অপছন্দের। এ নম্রতার কথা হযরত মুআবিয়া রা.-এরও অজানা ছিল না। তাই তাঁর বাইআতের পর তিনি গোটা দেশটাকেই নিজের আয়ত্তে আনতে চাইলেন। হযরত হাসান রা.-ও নিজের রাজত্বের কারণে মুসলমানদের মাঝে ঝগড়া-বিভেদ চাইতেন না। ফলে হযরত মুআবিয়া রা.-এর সাথে তিনি সন্ধি করে নিলেন এবং গোটা দেশের রাজত্ব হযরত মুআবিয়া রা.-এর হাতে সোপর্দ করে দিলেন।

৪১ হিজরীর রবিউল আওয়াল এই সন্ধি চূড়ান্ত হয়। এর সুবাদে দীর্ঘ সময় পর সকল মুসলমান একই পতাকাতলে আসে। আর এরই মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বানীরও প্রতিফলন ঘটে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন— 'আমার এই সন্তান হল সাইয়েদ (সর্দার/নেতা)। আশা করি আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন।' —সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭০৪

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

(অনুবাদ : আবদুল্লাহ ফাহাদ)

সুন্নত তরিকায় বিবাহ

যৌতুকবিহীন বিবাহে আগ্রহী
পাত্র-পাত্রী/অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন
সাক্ষাতের সময়
বৃহস্পতিবার : সকাল ৭-১১ টা
মঙ্গল ও বুধবার : সকাল ৯-১১টা
যোগাযোগ
সুন্নত তরিকায় বিবাহ সমিতি
প্রিন্সিপ্যাল মীযান সাহেব
৪১ নবাব কাটরা, নিমতলী, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৭৮-০৮১৪৭৭
০১৯১৩-১৮৭০৪২
ই-মেইল : saiful62779@gmail.com
www. sunnottorikaybibahosomity.org

কুতুবখালী মহিলা মাদরাসা এন্ড নূরানী ট্রেনিং সেন্টার

বিভাগসমূহ : ❖ নূরানী মক্তব, ❖ হিফযুল কুরআন, ❖ কিতাব বিভাগ, ❖ স্কুল (প্লে-৭ম)
সকল বিভাগে ভর্তি চলছে...
অস্বচ্ছল ও মেধাবীদের থাকা-খাওয়া বাবদ কোনো প্রদেয় নেই
মুআল্লিমা ট্রেনিংসমূহ '১৮
১মার্চ, ১মে, ১জুলাই, ১সেপ্টেম্বর, ১নভেম্বর
২০২, দক্ষিণ কুতুবখালী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
01675024838
01920789594

Scanned by CamScanner

ফিলহাল

জে রু জা লে ম

জোর যার মুল্লুক তার

‘এই ভূখণ্ডের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তারাই, যাঁরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বিধানের সামনে সমর্পিত এবং সত্যিকার অর্থে নবী-রাসূলগণের শিক্ষার উত্তরাধিকারী। তারা হচ্ছেন একমাত্র মুসলিম উম্মাহ, যারা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনে আল্লাহর আনুগত্য করেছেন। এখানে অন্য কারো ধর্মীয় উত্তরাধিকার দাবি করার সুযোগ নেই।

এই ভূখণ্ডের উপর নানা ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় অধিকার রয়েছে বলে যে কথাটি এখন ব্যাপক প্রচারিত তা একটি অতি সরল সমীকরণ মাত্র।’

লিখেছেন– আব্দুল্লাহ নাসীব

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করে একটি উত্তপ্ত পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছেন। তার পূর্বসূরি মার্কিন প্রেসিডেন্টরা যে কাজটি এতদিন এড়িয়ে গেছেন সেটিই তিনি সম্পাদন করলেন। নেপথ্যে কী কারণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা আমাদের মতো সাধারণ লোকের জানার কথা নয়, তবে এই কাজটি তিনি এমন এক সময়ে করলেন যখন উত্তর কোরিয়ার সাথে তার বাগযুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও উত্তর কোরিয়ার পক্ষ হতে নমনীয়তার লেশমাত্রও দেখা যায়নি। জেরুজালেম সংক্রান্ত এই ঘোষণা বিশ্বমোড়লের প্রেস্টিজ রক্ষার কোনো ছুতা কি না তা ভবিষ্যতই বলে দিবে।

উত্তর কোরিয়ার প্রতি আমাদের বাড়তি কোনো আবেগ নেই, কিন্তু জেরুজালেম আমাদের গভীর আবেগের জায়গা। হাজার বছর ধরে এই ভূখণ্ড ছিল নবী-রাসূলগণের পুণ্যভূমি, হকের দাওয়াত ও হক-বাতিলের যুদ্ধের এক খোলা ময়দান। বর্তমানেও এই ভূখণ্ডটি বিশ্বের কুফরী ও তাগূতী শক্তির চরম লাঞ্ছনার ক্ষেত্র। এই ভূমি নিরন্তর উন্মোচন করে চলেছে সভ্যতা ও মানবাধিকারের ভেক ধারণকারীদের প্রকৃত চেহারা। এই বাস্তবতাটুকুই খানিকটা আলোচনা করবার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা।

এই আকাশ-ভূমির স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই এর প্রকৃত মালিক। কাজেই এখানে তাঁরই ইবাদত হতে হবে এবং তাঁরই ফরমাবরদারি জারি থাকতে হবে। এই পয়গাম দিয়ে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং এক আল্লাহর ইবাদতকারী ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম-আহকামকে শিরোধার্যকারী উম্মাহ তৈরি করেছেন। অন্যদিকে বিতাড়িত শয়তানও তার দাওয়াত অব্যাহত রেখেছে এবং মানবজাতিকে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত করে শিরকের দিকে এবং আল্লাহর ফরমাবরদারি থেকে বিচ্যুত করে তার নাফরমানীর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। এভাবে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থেকেছে। পৃথিবীর যে পবিত্র ভূখণ্ডে ইসলাম তথা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণের দাওয়াতের বাহক অনেক নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে সেটি হচ্ছে বাইতুল মাকদিস ও এর আশপাশের অঞ্চল। এ অঞ্চল তাই এক বরকতময় অঞ্চল। আর এ কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত নবী রাসূলগণের প্রকৃত অনুসারী তাওহীদের শিক্ষা ধারণকারী মুমিন মুসলমানের কাছে এই ভূমি বরকতের এবং এর ইতিহাসের সাথে যুক্ত তাদের আদর্শিক শেকড়।

এই ভূখণ্ডের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তারাই, যাঁরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বিধানের সামনে সমর্পিত এবং সত্যিকার অর্থে নবী-রাসূলগণের শিক্ষার উত্তরাধিকারী। তারা হচ্ছেন একমাত্র মুসলিম উম্মাহ, যারা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনে আল্লাহর আনুগত্য করেছেন। এখানে অন্য কারো ধর্মীয় উত্তরাধিকার দাবি করার সুযোগ নেই।

এই ভূখণ্ডের উপর নানা ধর্মাবলম্বীর ধর্মীয় অধিকার রয়েছে বলে যে কথাটি এখন ব্যাপক প্রচারিত তা একটি অতি সরল সমীকরণ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তো সেটিই, যেটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং যে ধর্মে আল্লাহর বাণী ও বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংরক্ষিত। যে ধর্ম পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের শিক্ষা ও আদর্শের ধারাবাহিকতা।

এখানে শিক্ষা ও আদর্শই মূল, বংশ বা গোত্রের দাবি এখানে হাস্যকর। ইবরাহীম আ.-এর সর্বশেষ আদর্শিক উত্তরসূরি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীগণ। কুরআন মাজীদ কত স্পষ্ট ভাষায় এই সত্য বর্ণনা করেছে–

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ.

নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্টতম, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। –সূরা আলে ইমরান (৩) : ৬৮

এইটুকু বুঝলে একথা বোঝাও কঠিন নয় যে, আল্লাহর নবী হযরত মূসা আ.-এর প্রকৃত উত্তরসূরি কারা? হযরত মূসা আ.-এরও প্রকৃত উত্তরসূরি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মত। হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ

‘তোমাদের চেয়ে আমরাই (হযরত) মূসা আ.-এর বেশি হকদার।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭৩৪)

কারণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের যে পয়গাম নিয়ে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম এসেছিলেন সেই পয়গামের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এ কারণেই পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনা ও তাদের মর্যাদা রক্ষা করা ইসলামে অপরিহার্য। পক্ষান্তরে ইহুদী সম্প্রদায়ের ইতিহাস– নবীগণের শিক্ষার বিরোধিতা ও নবী-রাসূলের শানে চরম ধৃষ্টতার ইতিহাস। এখানে সেসব দৃষ্টান্তের বিশদ উল্লেখের অবকাশ নেই। কাজেই ইহুদীদের মুখে নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারের দাবি নিতান্তই হাস্যকর।

Scanned by CamScanner

ইমামুল মিল্লাতিল হানীফিয়্যাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বিবরণ কুরআন মাজীদে স্পষ্ট ভাষায় এসেছে–

وَ اِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ.

এবং স্মরণ কর যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং তা সে পূর্ণ করেছিল। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি। সে বলল, আমার বংশধরদের থেকেও। আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। –সূরা বাকারা (২) : ১২৪

কাজেই আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত জালিমেরা কখনোই মানবজাতির নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। এ হচ্ছে স্পষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ।

ঐতিহাসিক দিক থেকেও এই ভূখণ্ডের উপর ইহুদীদের কোনো অধিকার নেই। এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। কিন্তু আপাতত তার প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের দেশের স্যেকুলার অনেক লেখকও মৌলিকভাবে তা আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচনায়, যুক্তি-তর্কে অনেক ভুলভ্রান্তিও রয়েছে তবে মৌলিকভাবে ইহুদীদের অন্যায় দাবির প্রতিবাদে যা বলেছেন তার সবটা ভুল নয়। দৈনিক প্রথম আলোতে 'জেরুজালেম নিয়ে ট্রাম্পের উন্মাদ খেলার পরিণাম' শিরোনামে ফারুক ওয়াসিফ লিখেছেন–

'...জেরুজালেমের ওপর ইসরায়েলের দাবির ভিত্তিটা নাকি ঐতিহাসিক। পশ্চিমাদের অনেকেও মনে করে থাকেন, মিসরীয় দাসত্ব থেকে পালিয়ে হজরত মূসার নেতৃত্বে ইহুদিরা তৎকালীন কানান দখল করে বসত করে। ইহুদিদের ঈশ্বর এই ভূখণ্ড তাদের উপহার দিয়েছেন। এখানেই তাদের সোলোমন ও ডেভিড (আরবি ভাষায় সোলায়মান ও দাউদ) শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করলে তারা দুই হাজার বছরের জন্য উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। যে অল্পসংখ্যক ইহুদি সেখানে থেকে গিয়েছিল, সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমান বিজেতারা তাদের বহিষ্কার করে। এই দীর্ঘ নির্বাসিত জীবনে ইহুদি রক্ত আর কারও সঙ্গে মেশেনি, তারা রয়ে গেছে দুই হাজার বছর আগের মতোই খাঁটি বিশুদ্ধ এবং ইহুদিরা চিরকালের জন্য এক ও অখণ্ড 'জাতি'। চূড়ান্তভাবে ইউরোপে ইহুদি গণহত্যার পর 'ইহুদিরা দেশহীন মানুষ হিসেবে মানুষহীন দেশ ফিলিস্তিনে ফিরেছে।' তাদের প্রতিশ্রুত ইসরায়েল লোহিত সাগর থেকে শুরু করে জর্ডান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে একদিন। অর্থাৎ জর্ডান-সিরিয়ার বিরাট অঞ্চলসহ সমগ্র ফিলিস্তিনই হলো তাদের স্বপ্নের ইসরায়েল। এটাই তাদের সংবিধানে বলা আছে। আর এই মহান ইসরায়েল রাষ্ট্রের চিরকালীন অজেয় রাজধানী হলো জেরুজালেম।

'বারবার পশ্চিমা গণমাধ্যম, ইতিহাস, বিদ্যালয় থেকে শুরু করে সাহিত্যে এবং অবশ্যই হলিউডি চলচ্চিত্রে এই গল্প অকাট্য ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইহুদিদের ওপর শত শত বছর ধরে অত্যাচার ও গণহত্যা চালানো পাশ্চাত্য তার অপরাধবোধ থেকে বাঁচতে সর্বদাই ইসরায়েলের অন্যায্য দাবির ব্যাপারে রাজি অবস্থায় থাকে। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের সম্পদ ও ভূমি কবজায় রাখতে ইসরায়েলের মতো ধারালো অস্ত্র তো তাদের লাগবেই।

'যা হোক, এই গল্পে বাদ সেধেছেন ইতিহাসবিদেরা। তাঁদের প্রধানতম হলেন তেলআবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক শ্লোমো স্যান্ড।...

'স্যান্ড দেখিয়েছেন, বনি ইসরায়েল বলে যাদের কথা বাইবেলে বলা হয়েছে, আজকের ফিলিস্তিনি আরবেরাই (মুসলমান, ইহুদি, খ্রিষ্টান মিলিয়ে) তাদের বংশধর। ভাষাতাত্ত্বিক ও ডিএনএ মিলের প্রমাণ তিনি হাজির করেছেন। হজরত ইব্রাহিমের বংশধরেরাই দিনে দিনে বংশবৃদ্ধি করে ইহুদিদের সংখ্যা বাড়িয়েছে, এমন ধারণাও ঠিক নয়।

স্যান্ডের দাবি, দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এক জাতিভুক্ত ছিল না। বরং আরব ইহুদিরা আরবদের মতো, ইউরোপীয়রা ইউরোপীয় বংশধর এবং ইথিওপীয় কিংবা ভারতীয় ইহুদিরা যার যার জাতিরই বংশধর। আজকের ইহুদিদের রক্তে বহু জাতির রক্ত প্রবাহিত, জাতিগত বিশুদ্ধতার ধারণা তাই বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল।

এমনকি ইহুদি ধর্মগ্রন্থেও পবিত্র নগরীতে বসবাসে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া ছিল। কেননা, পবিত্র মাটিতে বসতি হলে পাপ ঘটার আশঙ্কা থাকে। ১৯ শতক পর্যন্তও ইহুদিদের কল্পনাতেও জেরুজালেমে ফিরার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না। কেবল বৃদ্ধরা মৃত্যুর আগে জেরুজালেমে আসত, পবিত্র মাটিতে কবর পাওয়ার আশায়। মুসলমানরা যেভাবে মক্কায় কবর পাওয়ার পুণ্যের আশা করে, সেভাবেই।

'সুতরাং ইসরায়েল সকল ইহুদীদের আদি বাসভূমি ছিল না, কেবল আরব ইহুদীরাই সেখানকার লোক।

'শ্লোমো স্যান্ড দেখিয়েছেন, একটি ইহুদী রাজ্য সত্যিই উচ্ছেদ হয়েছিল তবে সেটা কোনো আরবভূমি থেকে নয়। বরং পূর্ব ইউরোপের ককেশাস অঞ্চলের তুর্কি বংশোদ্ভূত খাজাররা একসময় দলে দলে ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল, সেখানে তাদের রাজত্বও ছিল। এদের বংশধরদেরই ইউরোপের ভূরাজনৈতিক চক্রান্তের অংশ হিসেবে আরবের বুকে শূলের মতো বিঁধিয়ে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। (প্রথম আলো, ৭ ডিসেম্বর, ২০১৭)

আমাদের দায়ীগণের এক কর্তব্য বর্তমান সভ্যতার অন্যায়-অবিচারের এই দৃষ্টান্তগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা। বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর মাজলুমিয়াতকে যুক্তি ও আবেগের সাথে তুলে ধরা এবং নিজেদেরকে ও গোটা উম্মাহকে ঈমান ও তাকওয়ায়, ইলম ও আমলে ঐ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা, যার নমুনা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। শুধু এ পথেই আল্লাহ তাআলার মদদ ও নুসরত হাসিল হতে পারে। ●

প্রচলিত 'ইঞ্জিল শরীফ'...

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

বরং তা ছিল একটি বাণী বা শিক্ষা। সেই শিক্ষা বর্তমান 'ইঞ্জিল' কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায়।' কিন্তু তারাই আবার পরক্ষণে বলে বেড়ান, 'ইঞ্জিলের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। ইঞ্জিলকে আসমানী কিতাব বলা হয়েছে। আল্লাহর কালাম বলা হয়েছে । আরো বলা হয়েছে হেদায়েত ও নূর।' খ্রিস্টানদের এই বিপরীতমুখী দাবি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একদিকে বলা হচ্ছে ইঞ্জিল কোনো কিতাব নয়, অন্যদিকে দাবি করা হচ্ছে ইঞ্জিলের কথা কুরআনে বলা হয়েছে। অথচ স্বীকৃত সত্য হল কুরআনে কারীমে যে ইঞ্জিলের কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহর নাযিলকৃত একটি কিতাব। কুরআন নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব কখনোই ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনী নয়, খ্রিস্টানদের কাছে স্বীকৃত ও প্রচলিত 'ইঞ্জিল শরীফ' নয়।

সারকথা, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিলকৃত ইঞ্জিল একটি কিতাব ছিল। তা তাঁর জীবনকালেও ছিল এবং এই ইঞ্জিলের কথাই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতেই পারি, প্রচলিত 'ইঞ্জিল শরীফ' কুরআনে বর্ণিত ইঞ্জিল নয়। ●

Scanned by CamScanner

01857848887 –

প্র তি বে শী

‘…মানবাধিকার সংস্থা আর মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক সংগঠনগুলো নীরব কেন? মিডিয়া ও স্বাধীনতার চেতনা ধারণকারীদের কণ্ঠস্বরও স্তব্ধ কেন? সরকারের কর্তব্য– শুধু বিজিবি-বিএসএফ পর্যায়ে নয়, উচ্চ পর্যায় থেকে তীব্র নিন্দা জানানো এবং… প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা যেমন করতে হবে তেমনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও দেশের নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে। একতরফা বন্ধুত্ব– বন্ধুত্ব নয়; এক প্রকারের দাসত্ব।’

বন্ধুর বন্দুকে…

লিখেছেন– আশিক বিল্লাহ

খরার মৌসুমে উজানের পানি বন্ধ করে হাজার হাজার হেক্টর কৃষি জমি বানজার করা; বর্ষার সিজনে বাঁধ খুলে দিয়ে শত সহস্র ঘরবাড়ি ভাসিয়ে দেওয়া; আর বিনোদনের নামে নোংরা সংস্কৃতির বিষ ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি বন্দুকের গুলিতে ‘বন্ধু-রাষ্ট্রে’র নাগরিকদের হত্যা করলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্রই বটে!

এই সেদিনও (১১ ডিসেম্বর ২০১৭) রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্তে একই বাড়ির দুই যুবক বিএসএফ-এর গুলির নির্মম শিকার হলেন। নিহত আবু আশরাফ (২৯) ও মিন্টু শেখ (২৭) সম্পর্কে চাচাত ভাই। তেমনিভাবে গত ১৯ ডিসেম্বর নওগাঁ জেলার পত্নীতলা সীমান্তে এরশাদ আলী নামে এক বাংলাদেশী যুবক বিএসএফের গুলিতে মারাত্মক আহত হন। ২১ ডিসেম্বর বিএসএফের হেফাজতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭)

মানবাধিকার সংগঠন ‘অধিকারে’র হিসাব মতে– গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত বিএসএফের হাতে নিহত হয়েছে ২০ বাংলাদেশী। অপহৃত হয়েছেন ২৭জন। যাদের অনেকেই হত্যার শিকার হয়েছেন। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১২ ডিসেম্বর ২০১৭)

সীমান্তহত্যা নিয়ে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মাঝে বহু বৈঠক ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও তা বন্ধ হয়নি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের একাধিক বৈঠকে সীমান্তহত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে ভারতের পক্ষ থেকে বার বার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এইসকল প্রতিশ্রুতির কোনো প্রতিফলন নেই।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এই বাহিনীকে উল্লেখ করেছে ‘ট্রিগার হ্যাপী’ বাহিনী হিসেবে। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে ‘সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না’ বলে জানানো হয়েছিল। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১২ ডিসেম্বর ২০১৭)

‘প্রাণঘাতী অস্ত্র’ ব্যবহার না করেও কীভাবে বাংলাদেশী হত্যা করা যায় তারও নজির রয়েছে বিএসএফের।

গত ১৯ ডিসেম্বর লালমনিরহাট জেলার পাঁচগ্রাম সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নির্যাতনে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান রশিদুল ইসলাম (৩২) নামে বাংলাদেশী এক যুবক। নিহত যুবক রশিদ কুচবিহার ৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়ান পানিশালা ক্যাম্পের একটি টহল দলের সদস্যের হাতে আটক হলে তাকে নির্যাতন করে ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে যায় বিএসএফ। গুরুতর অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রংপুর নিতে নিতে পথেই তার মৃত্যু হয়। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২১ ডিসেম্বর ২০১৭)

প্রতিবেশির দাবি, বাংলাদেশ তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত বন্ধু। বাংলাদেশও এই বন্ধুত্বে কৃতার্থ। কারণ বর্তমান যাই হোক অতীতেরও তো একটা দায় আছে! বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে প্রতিবেশীর অবদান তো কম নয়।

নিন্দুকেরা যতই বলুক বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের মদদদানের পেছনে তার নিজেরও স্বার্থ জড়িত ছিল এবং তা সে কড়ায় গণ্ডায় উসুল করে নিয়েছে, কিন্তু সব ঋণ কি উসুল করলেই শেষ হয়ে যায়? একচেটিয়া বাজার দখল, ট্রানজিটসহ বহু ফায়দা নিছক বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে লুফে নিলেও বাংলাদেশকে ক্ষুধা-পিপাসা, প্লাবন-আগ্রাসন সবকিছুই চোখবুজে সহ্য করেই যেতে হবে। এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্কের উপরে মুরুব্বিয়ানা শাসনও মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। বন্ধুত্বের ঋণ বলে কথা!

কিন্তু প্রশ্ন কি দাঁড়ায় না যে, ভারত বন্ধু রাষ্ট্রের নাগরিকদের যেভাবে গুলি করে হত্যা করে যাচ্ছে বছরের পর বছর, কথিত শত্রু-রাষ্ট্র পাকিস্তানের নাগরিকদের কি এভাবে গুলি করতে পারবে? ইট বা গুলি ছুড়তে গিয়ে আবার না পাটকেল বা গোলা নিক্ষিপ্ত হয়! বন্ধু-শত্রুর আচরণ ও উচ্চারণের সমীকরণ তবে কি এরকমই হয়!?

সীমান্তে ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে বেসামরিক লাশের মিছিল। ১১ থেকে ২১ মাত্র দশদিনের মাথায় ঘটে গেল চার চারটি হত্যাকাণ্ড। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে সীমান্তে এভাবে বেসামরিক লোক হত্যা করা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শামিল হলেও এর জন্য কোনো বিএসএফ সদস্যকে আইনের আওতায় আনা হয় না। বড়জোর যা হয়, তা হল-দুই দেশের পতাকা বৈঠকে কিংবা পত্র মারফত লাশ হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এই লাশ পেতেও কখনো বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। সম্প্রতি নিহত হতভাগা দুই ভাইয়ের মধ্যে মিন্টু শেখের লাশ পরিবার পেলেও আবু আশরাফের লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ। গোদাগাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিপজুর আলম জানান, আশরাফের লাশ ফেরত পেতে ডিএমসি সীমান্তে বিএসএফ-এর সাথে বিজিবির পতাকা বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১১ ডিসেম্বর ২০১৭)

এদিকে নিহত এরশাদ আলীর লাশ ফেরত চেয়ে ১৪ বিজিবির পক্ষ থেকে ১২২ বিএসএফ ব্যাটালিয়ানের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানান নওগাঁর পত্নীতলার ১৪ বিজিবির অধিনায়ক লে: কর্নেল খিজির খান। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭)

প্রশ্ন হচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে মানবাধিকার সংস্থা আর মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক সংগঠনগুলো নীরব কেন? মিডিয়া ও স্বাধীনতার চেতনা ধারণকারীদের কণ্ঠস্বরও স্তব্ধ কেন? সরকারের কর্তব্য– শুধু বিজিবি-বিএসএফ পর্যায়ে নয়, উচ্চ পর্যায় থেকে তীব্র নিন্দা জানানো এবং জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা যেমন করতে হবে তেমনি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও দেশের নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে। একতরফা বন্ধুত্ব– বন্ধুত্ব নয়; এক প্রকারের দাসত্ব। আর মুমিন হিসেবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে কুরআনের বাণী–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর। –সূরা মায়েদাহ (৫) : ৫৭

বন্ধু যখন থাকে বন্দুক তাক করে তখন বন্ধুত্বের পুনঃনিরীক্ষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে বলেই মনে হয়। •

Scanned by CamScanner

www.banglabookcenter.blogspot.com

Scanned by CamScanner